Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা মাসলুনা

রোলঃ 23100120036

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা মাসলুনা

রোলঃ 23100120036

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা মাসলুনা, আইডিঃ 23100120036 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Farhana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারহানা মাসলুনা

আইডিঃ 23100120036

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

আব্দুল মুত্তালিব- এর জীবনী 7

রাসূল সাঃ এর জন্ম সাল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 9

শৈশব ও কৈশোরকাল 11

পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান 13

হযরত খাদিজা (রা.) জীবন ও ভূমিকা 16

যৌবনকাল ও ব্যবসায়িক জীবন 20

নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবন 24

প্রথম ওহি ও নবুয়ত প্রাপ্তি 26

মক্কী জীবন ও দাওয়াত 34

নির্যাতন ও সাহাবিদের ত্যাগ 38

হিজরত 41

মদিনায় ইসলামী সমাজ গঠন 45

পারিবারিক জীবন (স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ) 52

সাহাবিদের সাথে সম্পর্ক 59

যুদ্ধসমূহ ও শান্তিচুক্তি 65

বিদায় হজ 74

অসুস্থতা, ওফাত ও ইন্তেকাল 78

ওফাত-পরবর্তী প্রভাব 85

জীবন থেকে শিক্ষা ও উপসংহার 87

তথ্যসূত্র: 89

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"الحمد لله رب العلمين، واصلوة والسلام على رسوله الكريم ، أما بعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, রহমাতুল্লিল আলামীন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর প্রতি; যিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে তাওহীদ, ন্যায়, ইনসাফ ও মানবতার আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন।

মানব ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যাঁর জীবন প্রতিটি দিক থেকে এত গভীরভাবে সংরক্ষিত, আলোচিত ও অনুসৃত হয়েছে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন। তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী অবস্থা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, নবুয়ত, দাওয়াত, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধনীতি, পারিবারিক জীবন, ইবাদত, আখলাক—প্রতিটি অধ্যায় মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এজন্যই সিরাতে রাসূল ﷺ অধ্যয়ন কেবল একটি ঐতিহাসিক গবেষণা নয়; বরং এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

রাসূল ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজ চরম জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল। সমাজে শিরক, কুসংস্কার, সুদ, মদ, জুয়া, নারী নির্যাতন, গোত্রীয় সংঘাত ও নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নির্মম প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল। ঠিক এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা মানবতার মুক্তির জন্য প্রেরণ করেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرً
"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"
আহযাব [২১]

আবার আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
"আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি"
আম্বিয়া [১০৭]

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর জীবন কেবল একটি জাতি বা যুগের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজ নানাবিধ সংকট, বিভ্রান্তি ও নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন। মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই রাসূল ﷺ-এর জীবনী অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাঁর জীবন মানবজাতিকে সত্য, ন্যায়, ধৈর্য, ত্যাগ, সহনশীলতা, দয়া ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দেয়।

এখানে রাসূল ﷺ-এর জীবনীর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক, বিশেষত মক্কী জীবন ও দাওয়াত, নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা, এবং ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াতি কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি কুরআনের আয়াত, হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রের আলোকে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে আমরা রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটিকে দ্বীনের খেদমতের মাধ্যম বানিয়ে দিক। আমিন।

আব্দুল মুত্তালিব- এর জীবনী

আব্দুল মুত্তালিব, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা, কুরাইশ গোত্রের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

তার জন্ম, নেতৃত্ব ও অবদান মক্কার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

জন্ম ও বংশ

আব্দুল মুত্তালিব-এর জন্ম হয়েছিল মদিনা নগরীতে, যা তখন ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। তিনি হাশিম ইবনে আবদে মানাফ-এর পুত্র এবং সালমা বিনতে আমরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনী হাশিম বংশের একজন সদস্য, যা কুরাইশ গোত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শাখা।

নামকরণ:

শৈশবে আব্দুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম ছিল শায়বা, কিন্তু চাচা মুত্তালিব তাকে মক্কায় নিয়ে আসার পর লোকজন তাকে মুত্তালিবের দাস মনে করে "আব্দুল মুত্তালিব" নামে ডাকতে শুরু করে। এই নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন।

মক্কার নেতৃত্ব

আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশ গোত্রের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মক্কার একজন বিশিষ্ট সম্মানিত নেতা এবং কাবা শরীফের তাঁর জীবনের অন্যতম বড় অবদান হলো জমজম কূপ পুনরুদ্ধার।

বহু বছর পর তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পেয়ে জমজম কূপ খুঁজে বের করেন এবং পুনরায় তা চালু করেন, যা আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য বরকতময়।

আব্দুল মুত্তালিব কাবা শরীফের একজন সম্মানিত খাদেম ছিলেন। তিনি কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দুটি দায়িত্ব পালন করতেন, যা হলো সিকায়াহ ও রিফাদাহ।

সিকায়াহ (سِقَايَة) বলতে বোঝায়—হজযাত্রীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করা।

তিনি হাজীদের পানি পান করাতেন, বিশেষ করে জমজমের পানি সরবরাহ করতেন।

এটি ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক একটি দায়িত্ব।
অন্যদিকে, রিফাদাহ (رِفَادَة) বলতে বোঝায়—হজযাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। তিনি নিজের সম্পদ ব্যয় করে গরীব ও আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন।

জমজম কূপ পুনরুদ্ধার

তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে জমজম কূপ পুনরায় আবিষ্কার করেন। বহু বছর ধরে এটি অদৃশ্য ছিল, কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর নির্দেশে এটি পুনরায় খনন করেন, যা মক্কার মানুষের জন্য এক বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

আবরাহার হাতি বাহিনী

আব্দুল মুত্তালিব এর জীবদ্দশায় ইয়েমেনের শাসক আবরাহা কাবা ধ্বংসের জন্য হাতি বাহিনী নিয়ে মক্কায় আগমন করেন। আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলেছিলেন, "কাবার একজন মালিক আছেন, তিনিই তা রক্ষা করবেন।
পরে আল্লাহর অলৌকিক সহায়তায় কাবা রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ।

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?

রাসূল ﷺ-এর প্রতি আব্দুল মুত্তালিব এর ভালোবাসা

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অতি স্নেহ করতেন এবং পিতামাতা হারানোর পর তাকে লালন-পালন করেছিলেন।
ভবিষ্যতে রাসূল ﷺ-ই আল্লাহর রাসূল হবেন এমন বিশ্বাসও তার ছিল।

রাসূল সাঃ এর জন্ম সাল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর আগমন মানব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেন,

যেখানে অজ্ঞতা, শিরক, অন্যায় ও নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

জন্ম সাল ও স্থান

জন্ম সাল

ইতিহাসবিদ ও সিরাত বিশেষজ্ঞদের মতে মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতামত রয়েছে।

প্রচলিত মত অনুযায়ী রাসূল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসের **১২** তারিখে, সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। এই মতটি বহু সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এই বছরকে বলা হয় "হাতির বছর"। তিনি জন্মগ্রহণ করেন আরবের পবিত্র নগরী মক্কাতে। এই বছরের নামকরণের পেছনে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—ইয়ামানের শাসক আবরাহা বিশাল হাতি বাহিনী নিয়ে কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজ

রাসূল ﷺ এর জন্মের পূর্বে আরব সমাজ ছিল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সময়কে বলা হয় "জাহেলিয়াত যুগ"।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হয়। তখন পৃথিবী রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় কোনো নবী আগমন না করায় মানুষ ক্রমশ সত্যপথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আসমানি ধর্মসমূহ বিকৃতির শিকার

হয়েছিল এবং মানবসভ্যতা জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এমন এক সময়ে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন।[1]

ধর্মীয় অবস্থা

অধিকাংশ মানুষ মূর্তিপূজা করত
কাবার ভিতরে শত শত মূর্তি স্থাপিত ছিল
মানুষ আল্লাহকে মানলেও শিরকে লিপ্ত ছিল

সামাজিক অবস্থা

সামাজিকভাবে তখনকার আরব ছিল অত্যন্ত অবিচারপূর্ণ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজ সামাজিকভাবে চরম অবক্ষয়ের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। গোত্রবাদ, নারী নির্যাতন, দাসপ্রথা, মদ-জুয়া, শক্তিশালীর অত্যাচার এবং নৈতিক অবক্ষয় সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল।
কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ চলত দুর্বলদের উপর জুলুম করা হতো। ইসলাম এসে এই সমাজে মানবতা, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন আরব সমাজে—সুদ ও জুয়া ব্যাপক ছিল
ধনী-গরিবের বৈষম্য ছিল চরম, প্রতারণা ও অন্যায় ব্যবসা প্রচলিত ছিল মক্কা ছিল তখন প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

রাজনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন বিশ্বে দুইটি বড় শক্তি ছিল
রোমান সাম্রাজ্য - পারস্য সাম্রাজ্য।
এই দুই শক্তির মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ চলছিল। আরব উপদ্বীপে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না, ফলে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

রাসূল ﷺ এর আগমনের গুরুত্ব

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী বা বার্তাবাহক।

তাঁকে পুরো মানবজাতির হিদায়াতের পথ দেখানোর দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।

এই অন্ধকার যুগে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রেরণ করেন। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন।

মানবজাতি পরকালে কীভাবে সফল হবে—তার একটি স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়াই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

তিনি এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন, নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেন

মানবতাকে সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"

শৈশব ও কৈশোরকাল

প্রবক্তা মুহাম্মদ ﷺএর শৈশব ও কৈশোরকাল মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় অধ্যায়। তাঁর এই সময়কার জীবন ছিল দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম, ধৈর্য, সততা ও মহান চরিত্র গঠনের উজ্জ্বল উদাহরণ। মহান আল্লাহ তা'আলা শৈশব থেকেই

তাঁকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করেন এবং জাহেলি সমাজের সকল অপসংস্কৃতি ও অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করেন। পরবর্তীতে তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের ঘটনাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছিলেন।

হালিমা সাদিয়া — এর তত্ত্বাবধানে লালন-পালন

আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিশুদের বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষা ও নির্মল পরিবেশে বড় করে তোলার জন্য মরু অঞ্চলের বেদুঈন নারীদের নিকট লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হতো। সেই রীতি অনুযায়ী প্রবক্তা মুহাম্মদ ﷺ–কে হালিমা সাদিয়া—এর নিকট অর্পণ করা হয়।

হালিমা ছিলেন দরিদ্র নারী কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে আগমনের পর তাদের পরিবারে আল্লাহর বিশেষ বরকত নেমে আসে। পশুগুলো অধিক দুধ দিতে শুরু করে এবং অভাব-অনটন দূর হতে থাকে। এতে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, এই শিশু বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মরুর নির্মল পরিবেশে তিনি বিশুদ্ধ ভাষা, ধৈর্য, সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা লাভ করেন।

মাতৃহারা ও দাদার তত্ত্বাবধান

ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহব–কে হারান। মদিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এত অল্প বয়সে মাতৃহারা হওয়া ছিল তাঁর জীবনের অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা।

এরপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং কা'বার পাশে নিজের আসনে বসাতেন। কিন্তু দুই বছর পর তিনিও ইন্তিকাল করেন।

আবু তালিবের তত্ত্বাবধান ও কৈশোরকাল

দাদার মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। যদিও তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন না, তবুও অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে লালন-পালন করেন।

কৈশোরকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচার কাজে সহযোগিতা করতেন এবং বকরী চরাতেন।

এর মাধ্যমে তিনি ধৈর্য, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকেই বকরী চরিয়েছেন।

পরবর্তীতে তিনি চাচার সঙ্গে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তাঁর সততা ও আমানতদারিতা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মক্কার লোকেরা তাঁকে “আল-আমিন” (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করে।

চরিত্র গঠনে শৈশব ও কৈশোরের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শৈশব ও কৈশোরের কষ্ট ও অভিজ্ঞতা তাঁর মহান চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। এতিম জীবন তাঁকে অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। দারিদ্র্য ও সংগ্রাম তাঁকে ধৈর্যশীল ও আত্মনির্ভরশীল বানায়। সমাজের অন্যায় ও অশান্তি প্রত্যক্ষ করে তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

“তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন।”

পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনচরিতের প্রতিটি অধ্যায় মানবজাতির জন্য শিক্ষা, উপদেশ ও দিকনির্দেশনায় পরিপূর্ণ। তাঁর শৈশব জীবন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ সময়েই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভবিষ্যৎ নবুওয়তের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেন।

জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা হওয়া, অল্প বয়সে মাতৃহারা হওয়া এবং পরে দাদা হারানোর মতো কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন। কিন্তু প্রতিটি ধাপেই আল্লাহ তাআলার বিশেষ তত্ত্বাবধান তাঁর সাথে ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের এই অধ্যায় আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে বড় দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেন, তাকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের মাধ্যমে তাঁর শৈশবের লালন-পালন ছিল আল্লাহর হিকমতপূর্ণ পরিকল্পনার অংশ।

পিতার তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশব জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্ট ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল

মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন। ফলে জন্মের পর থেকেই তিনি পিতার স্নেহ, ভালোবাসা ও সরাসরি তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হন।

সাধারণত একটি শিশুর জীবনে পিতা নিরাপত্তা, আশ্রয় ও সাহসের প্রতীক হয়ে থাকেন। পিতার মাধ্যমে সন্তান পারিবারিক মর্যাদা, দিকনির্দেশনা ও অভিভাবকত্ব লাভ করে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সুযোগ পাননি।

এটি ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা।

হযরত আব্দুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান, ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মদিনায় তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। সে সময় আমিনা গর্ভবতী ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আসার আগেই এতিম হয়ে যান।

এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে কখনো অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। বরং আল্লাহ নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁকে গড়ে তুলেছেন। পিতার অনুপস্থিতি তাঁর অন্তরে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে তিনি এতিম ও অসহায় মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু আচরণ করতেন। কারণ তিনি নিজেই এতিম জীবনের কষ্ট অনুভব করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতিম জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহর সাহায্য ও রহমত সবসময় তাঁর সঙ্গে ছিল।

মাতার স্নেহ-মমতা ও লালন-পালন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওহাব ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, স্নেহশীলা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী। স্বামীর ইন্তিকালের পর তিনি একাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতৃহীন সন্তান হওয়ায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ছিলেন।

আরবের রীতি অনুযায়ী শহরের শিশুকে মরু অঞ্চলে পাঠানো হতো, যাতে তারা বিশুদ্ধ ভাষা ও নির্মল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। এই কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনি সাদ গোত্রের মহিলা হযরত হালিমা সাদিয়া -এর নিকট অর্পণ করা হয়। হালিমা সাদিয়া অত্যন্ত স্নেহ ও আন্তরিকতার সাথে তাঁকে লালন-পালন করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ফলে তাঁদের পরিবারে বরকত নেমে আসে। শুকিয়ে যাওয়া উট দুধ দিতে শুরু করে, দুর্বল প্রাণীগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাঁদের জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রিয় নবীকে বিশেষ রহমতের মাধ্যমে ঘিরে রেখেছিলেন।
কিছু বছর পর তিনি মায়ের কাছে ফিরে আসেন। মা আমিনা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্নে লালন করতেন।
তিনি নবীজিকে নিয়ে মদিনায় বাবা আব্দুল্লাহ-এর কবর জেয়ারত করতে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।
মাতার মৃত্যু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। এত অল্প বয়সে মাতৃহারা হওয়া একটি শিশুর জন্য অনেক বড় কষ্টের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্য দান করেন। এরপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেন।
তিনি নবীজিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। পরে দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অভিভাবকদের স্নেহ ও তত্ত্বাবধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে দাদা আব্দুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের সম্মানিত নেতা। তিনি নবীজিকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। কাবাঘরের পাশে তাঁর জন্য বিশেষ আসন রাখা থাকত।
অন্য কেউ সেখানে বসতে সাহস করত না। কিন্তু ছোট্ট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসলে তিনি আনন্দিত হতেন এবং বলতেন, "আমার এই সন্তানের ভবিষ্যৎ অনেক মহান হবে।"
দুই বছর পর আব্দুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করলে চাচা আবু তালিব নবীজির তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেন। যদিও তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন না, তবুও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নবীজির দেখাশোনা করতেন। তিনি কখনো তাঁকে একা ছেড়ে দিতেন না এবং সর্বদা তাঁর নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। ব্যবসায়িক সফরেও তিনি নবীজিকে সঙ্গে

নিয়ে যেতেন। আবু তালিবের ভালোবাসা ও সহযোগিতা নবীজির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

হযরত খাদিজা (রা.) জীবন ও ভূমিকা

হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং মুসলিম নারীদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর প্রথম স্ত্রী, প্রথম বিশ্বাসী, প্রথম সহযোগী এবং ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন শুধু একজন স্ত্রীর জীবন নয়; বরং এটি ঈমান, ত্যাগ, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
ইসলামের সূচনালগ্নে যখন পুরো আরব সমাজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল, তখন হযরত খাদিজা (রা:) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করেন। তাঁর অবদান ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস কল্পনাও করা যায় না। তিনি নিজের সম্পদ, সময়, শক্তি ও ভালোবাসা সবকিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

বংশপরিচয় ও শৈশব জীবন

হযরত খাদিজা (রা.)-এর পূর্ণ নাম ছিল খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ। তিনি কুরাইশ বংশের বনু আসাদ গোত্রের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ছিলেন মক্কার সম্মানিত ব্যবসায়ী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে যায়িদাও ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী।
জাহেলি যুগে যখন সমাজে অশ্লীলতা, মূর্তিপূজা ও নানা অন্যায় প্রচলিত ছিল, তখনও হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন চরিত্র, সততা ও পবিত্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি “আত-তাহিরা” বা “পবিত্র নারী” নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সততা, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম আচরণের কারণে মক্কার মানুষ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত।

ব্যবসায়িক জীবন ও ব্যক্তিত্ব

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী।

সে সময় আরব সমাজে নারীদের ব্যবসা পরিচালনা খুব সাধারণ বিষয় ছিল না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাঁর ব্যবসায়িক কাফেলা সিরিয়া, ইয়েমেনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করত।

তিনি ব্যবসার কাজে বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তিনি তাঁকে নিজের ব্যবসায়িক কাফেলার দায়িত্ব দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং পূর্বের তুলনায় অধিক লাভ নিয়ে ফিরে আসেন।

খাদিজা (রা.)-এর গোলাম মাইসারা নবীজির অসাধারণ চরিত্র, নম্রতা, সততা ও সুন্দর আচরণের কথা তাঁকে জানালে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এরপর তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তখন নবীজির বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর।

এই বিবাহ ছিল পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস ও ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.)-এর জীবিত অবস্থায় আর কোনো বিবাহ করেননি। তাঁদের সংসার জীবন ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও বরকতময়।

হযরত খাদিজা (রা.) নবীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সবসময় তাঁর মানসিক প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকতেন। নবীজিও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরও বারবার তাঁকে স্মরণ করতেন।

প্রথম ওহি এবং খাদিজা (রা.)-এর অবদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হেরা গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর প্রথম ওহি নাযিল করেন। জিবরাইল (আ.) তাঁকে “ইকরা” পড়ার নির্দেশ দেন।

এই ঘটনা নবীজির জন্য ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ও ভীতিকর।

তিনি ঘরে ফিরে এসে বলেন।

“زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي”

“আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও”

এ সময় হযরত খাদিজা (রা.) নবীজিকে শান্তনা দেন এবং সাহস জোগান।
খাদিজা (রা.)তিনি বলেন—"কখনোই না! আল্লাহ আপনাকে অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন, অতিথির সম্মান করেন এবং সত্যের পথে সহযোগিতা করেন।"
এই কথাগুলো শুধু সান্ত্বনা ছিল না; বরং নবীজির নবুওয়াতের সত্যতার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ছিল।
এরপর তিনি নবীজিকে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা নবীজির ঘটনা শুনে বলেন যে, এটি সেই ফেরেশতা যিনি পূর্ববর্তী নবীদের কাছেও এসেছিলেন।

ইসলামের প্রথম গ্রহণকারী

হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেন। এজন্য তিনি ইসলামের প্রথম মুমিনা হিসেবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

যখন সমাজের মানুষ নবীজিকে মিথ্যাবাদী বলত, তখন খাদিজা (রা.) তাঁকে সত্যবাদী হিসেবে সমর্থন করতেন, যখন সবাই বিরোধিতা করত, তখন তিনি পাশে দাঁড়াতেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"তিনি তখন আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল; তিনি তখন আমাকে সত্যবাদী বলেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।"

ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন নেমে আসে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে।
শিবে আবি তালিবে তিন বছর মুসলমানরা কঠিন অবরোধের মধ্যে জীবনযাপন করেন। খাদ্যের অভাব, কষ্ট ও দুঃখ সত্ত্বেও হযরত খাদিজা (রা.) ইসলামের পথ থেকে পিছিয়ে যাননি। তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন।
তাঁর এই আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি শুধু একজন স্ত্রী ছিলেন না; বরং ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন।

নবীজির কাছে তাঁর মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাঁর মৃত্যুর পরও নবীজি প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন

আমি নবীজির অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি এতটা ঈর্ষান্বিত হইনি, যতটা খাদিজা (রা.)-এর প্রতি হয়েছিলাম।

হযরত জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদিজা (রা.)-এর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে আসেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরাইল আমাকে খাদিজার জন্য জান্নাতে মুক্তা দিয়ে নির্মিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আরও একটি হাদিসে এসেছে,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীদের মধ্যে একজন হলেন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ।

ইন্তিকাল ও শোকের বছর

নবুওয়াতের দশম বছরে হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে গভীর শোকের কারণ হয়। একই বছরে তাঁর চাচা আবু তালিবও ইন্তিকাল করেন। এজন্য সেই বছরকে “আমুল হুযন” বা “শোকের বছর” বলা হয়।

খাদিজা (রা.) এর মৃত্যু নবীজির জীবনে এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। কারণ তিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় মানসিক শক্তি ও সহযোগী।

কুরআনের আলোকে তাঁর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা কুরআনুক কারীমে- মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ নারীদের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

হযরত খাদিজা (রা.) তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ওয়াসাল্লামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য খাদিজা (রা.) ছিলেন সর্বোত্তম সঙ্গিনী। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন।"

ইসলাম প্রচারের চরম দুঃসময়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ধন-সম্পদ ও নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে রাসুল (সা.) ও দ্বীন ইসলামের সাহায্য করেছিলেন

যৌবনকাল ও ব্যবসায়িক জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও কল্যাণের দিকনির্দেশনা। বিশেষত তাঁর যৌবনকাল ও ব্যবসায়িক জীবন আমাদের সামনে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, আমানতদারি ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।

জাহেলি যুগে আরব সমাজ ছিল নৈতিক অবক্ষয়, মূর্তিপূজা, সুদ, জুয়া, মদপান, প্রতারণা ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত। সেই অন্ধকার যুগেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনো সমাজের অন্যায় ও কুসংস্কারের সাথে নিজেকে জড়াননি। বরং ছোটবেলা থেকেই তিনি সত্যবাদিতা, ন্যায়নীতি ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বিশেষ স্থান লাভ করেন।

তাঁর যৌবনকাল ছিল ভবিষ্যৎ নবুওয়াতের প্রস্তুতিপর্ব। আর তাঁর ব্যবসায়িক জীবন ছিল ইসলামী অর্থনীতি ও নৈতিক বাণিজ্যনীতির বাস্তব উদাহরণ।

যৌবনকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যৌবনকালে আরব সমাজকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত" বা অজ্ঞতার যুগ বলা হতো। সে সময় সমাজে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় প্রচলিত ছিল। শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত, নারীদের মর্যাদা ছিল না, সুদ ও প্রতারণা ব্যবসার সাধারণ রীতি ছিল এবং গোত্রীয় সংঘাত ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

কাবাঘরে অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তির ইবাদত করত। মদপান, জুয়া ও অশ্লীলতাকে সমাজে খারাপ মনে করা হতো না।

এই পরিবেশে থেকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব-আল্লাহ তাআলা তাঁকে শৈশব থেকেই সকল ধরনের পাপ ও অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মদপান করেননি, মূর্তির সামনে সিজদা করেননি এবং জাহেলি সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণদ করেননি, তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

যৌবনকালে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

যৌবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি ছিলেন নম্র, মার্জিত, ধৈর্যশীল ও সত্যবাদী। মানুষের সাথে সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং অসহায়দের সাহায্য করার জন্য তিনি সবার কাছে সম্মানিত হয়ে ওঠেন।

মক্কার মানুষ তাঁর চরিত্রে এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, তাঁকে "আল-আমিন" (বিশ্বস্ত)
ও আস-সাদিক (সত্যবাদী) উপাধি দেয়।

তাঁর সততা এতটাই প্রসিদ্ধ ছিল যে, মানুষ নিজেদের মূল্যবান সম্পদ ও আমানত তাঁর কাছে জমা রাখত। পরবর্তীতে নবুওয়াতের পর যখন মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে, তখনও তারা নিজেদের আমানত তাঁর কাছেই রাখত। কারণ তারা জানত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খিয়ানত করেন না।

জীবিকা অর্জনের সূচনা ও ছাগল চরানো

শৈশবে এতিম হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প বয়স থেকেই জীবনের কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি প্রথমে ছাগল চরানোর কাজ করেন।

ছাগল চরানো ছিল সাধারণ ও কষ্টসাধ্য কাজ। এর মাধ্যমে ধৈর্য, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা নবীদের জীবনে এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁদের মানবিক গুণাবলি বিকাশ ঘটিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি।'

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনিও কি?

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি মক্কার মানুষের ছাগল চরাতাম।"

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, শ্রম ও কষ্ট মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যবসায়িক জীবনে প্রবেশ:

আরবের অর্থনীতি মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মক্কা ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কুরাইশরা শীতকালে ইয়েমেন এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফর করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনে ব্যবসা শুরু করেন এবং খুব অল্প সময়েই সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে সবার আস্থা অর্জন করেন।

তাঁর ব্যবসায়িক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল,

সততা

আমানতদারি

ন্যায্যতা

প্রতারণামুক্ত লেনদেন

ওজনে সঠিকতা

গ্রাহকের প্রতি সদাচরণ

মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকা

তিনি কখনো অধিক লাভের জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করেননি।

হযরত খাদিজা (রা.)এর ব্যবসা পরিচালনা

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসায়িক কাফেলার দায়িত্ব দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.) এর পণ্য নিয়ে সিরিয়া সফরে যান। সফরে তাঁর সাথে ছিলেন খাদিজা (রা.)-এর খাদেম মাইসারা।

এই সফরে মাইসারা নবীজি ﷺ-এর অসাধারণ চরিত্র ও সততা প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন-

নবীজি কখনো মিথ্যা বলেন না

কারও সাথে প্রতারণা করেন না

কর্মচারীদের সাথে সদাচরণ করেন

ব্যবসায় ন্যায্যতা বজায় রাখেন

সর্বদা শালীন আচরণ করেন

সফর শেষে তিনি অধিক লাভ নিয়ে ফিরে আসেন। মাইসারা সব ঘটনা খাদিজা (রা.)-কে জানালে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে তিনি নবীজির কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।

ব্যবসায়িক সততা ও ইসলামী নীতিমালা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবসায়িক জীবন ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি ব্যবসাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাঃ তিনি বলেন—

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

তিনি আরও বলেছেন—

যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

এই হাদিসগুলো ব্যবসায় সততা ও নৈতিকতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ

যৌবনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “হিলফুল ফুযুল” নামক ন্যায়ভিত্তিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করেন।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিতদের সাহায্য করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি বলেন—

আমি এমন এক চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছি, যা লাল উটের চেয়েও আমার কাছে প্রিয়। ইসলামের যুগেও যদি এমন আহ্বান করা হয়, আমি অবশ্যই তাতে অংশগ্রহণ করব। এটি প্রমাণ করে, নবুওয়াতের আগেও তিনি সমাজ সংস্কার ও মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নবুওয়াতের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যৌবনকাল ছিল নবুওয়াতের প্রস্তুতিপর্ব। আল্লাহ তাআলা তাঁর চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে।

তিনি নির্জনে ধ্যান ও চিন্তা-ভাবনা করতেন। হেরা গুহায় দীর্ঘ সময় ইবাদত ও চিন্তায় কাটাতেন। সমাজের অন্যায়, মূর্তিপূজা ও নৈতিক অবক্ষয় তাঁকে ব্যথিত করত।

ইসলাম ধর্মে, মুহাম্মদের প্রথম ওহির সঠিক সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, এটি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়ে মুহাম্মাদ ধারাবাহিকভাবে কিছু অতিন্দ্রিয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, যেখানে তাঁকে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্পর্কে জানানো হয়। এরপর তিনি একাকীত্ব খুঁজে নিতে মক্কার কাছে জাবালে আল-নূর পর্বতের হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান শুরু করেন। সেখানে অবস্থানকালেই তাঁর কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আঃ উপস্থিত হন এবং তাঁকে কুরআনের প্রাথমিক অংশ অবতীর্ণ করেন।

অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় তাঁর ওপর প্রথম ওহি নাযিল হয় এবং তিনি নবুওয়াত লাভ করেন।

ভবিষ্যৎ নবুওয়াতের প্রস্তুতি

৪০ বছর বয়সে ওহী বা নবুওয়াত লাভের পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুদীর্ঘ জীবন ছিল এক ঐশ্বরিক ও সুশৃঙ্খল প্রস্তুতি পর্ব। নবুওয়াতের মতো এক মহান ও গুরুভার দায়িত্ব বহনের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চারিত্রিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন।

ঐশ্বরিক তত্ত্বাবধান ও বক্ষ বিদীর্ণকরণ (শৈশবেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরকে জাগতিক কলুষতা ও শয়তানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) কর্তৃক তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ (সিনা চাক) করা হয়। এটি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ নবুওয়াতের গুরুভার বহনের প্রথম আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি।

নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবন

কাবা পুনর্নির্মাণ ও হজরে আসওয়াদ স্থাপন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন বন্যার কারণে কাবাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্মাণকাজ শেষ হলে হজরে আসওয়াদ কে স্থাপন করবে, তা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের

মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রথম প্রবেশকারী ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁকে দেখে সবাই আনন্দে বলে ওঠে, “এ তো আল-আমীন! আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাদর বিছিয়ে তার ওপর হজরে আসওয়াদ রাখেন। এরপর প্রতিটি গোত্রের নেতাকে চাদরের একেক প্রান্ত ধরতে বলেন। তারা সবাই মিলে পাথরটি নির্ধারিত স্থানের কাছে নিয়ে গেলে তিনি নিজ হাতে তা স্থাপন করেন। এভাবে তাঁর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে একটি বড় সংঘাতের অবসান ঘটে

জাহিলিয়াতের সমাজ থেকে আত্মরক্ষা

যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সমাজে বসবাস করতেন যেখানে মূর্তিপূজা, মদ্যপান, সুদ, অশ্লীলতা ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তবুও তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুয়তের পূর্ব থেকেই বিশেষভাবে হেফাজত করেছেন।

তিনি কখনো কোনো মূর্তির সামনে সিজদা করেননি, মদ পান করেননি এবং জাহিলিয়াতের কোনো অন্যায় কাজে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর পবিত্র চরিত্রের কারণে মক্কার মানুষ তাঁকে "আস-সাদিক" (সত্যবাদী) ও "আল-আমীন" (বিশ্বস্ত) নামে ডাকত।

নির্জনতা ও চিন্তামগ্ন জীবন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও শিরকপূর্ণ পরিবেশে মানসিকভাবে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তিনি একাকীত্ব পছন্দ করতেন এবং আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

বিশেষ করে রমজান মাসে তিনি মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় অবস্থান করতেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় ইবাদত, ধ্যান ও চিন্তায় কাটাতেন। তিনি মানুষের পথভ্রষ্টতা দেখে ব্যথিত হতেন এবং সত্যের সন্ধান করতেন।

এই নির্জনতা ছিল নবুয়তের মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি। আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয়কে ওহি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

ওহির সূচনা ও নবুয়তের সূচনালগ্ন

৪০ বছর বয়সে, রমজান মাসের এক বরকতময় রাতে হেরা গুহায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রথম ওহি অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতা জিবরীল (আ.) এসে তাঁকে বলেন, "ইকরা" (পড়ুন)।

এরপর সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়। এর মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা ঘটে এবং মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

মুহাম্মাদ ﷺ শুধু মক্কার একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি নন; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

নবুয়তের পূর্ববর্তী চল্লিশ বছরের জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যৎ নবুয়তি মিশনের প্রস্তুতিকাল। ইয়াতীম জীবন, দারিদ্র্য, ব্যবসা, সততা, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, নির্জনতা ও গভীর চিন্তাশীলতা—এসব গুণ তাঁকে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও সর্বশেষ নবী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিল। তাই নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা কীভাবে ধাপে ধাপে তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

প্রথম ওহি ও নবুয়ত প্রাপ্তি

মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত ঘটনা হলো মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি নাযিল হওয়া। এই ঘটনাই পৃথিবীতে হিদায়াতের নতুন সূচনা করে। মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন আলোকিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে নবুয়তের মহান দায়িত্ব প্রদান করেন।

প্রথম ওহির মাধ্যমে রাসূল ﷺ শুধু নবী হিসেবেই ঘোষিত হননি; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত, পথপ্রদর্শক ও মুক্তির দূত হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

এই আয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার সূচনা হয়।

নবুয়তের পূর্ববর্তী অবস্থা আরব সমাজের অন্ধকার যুগ।

রাসূল ﷺ–এর নবুয়তের পূর্বে আরব সমাজ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মানুষের মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা, অন্যায়, সুদ, জুয়া, ব্যভিচার, হত্যা ও নারীর প্রতি অবিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্বলদের ওপর শক্তিশালীদের অত্যাচার ছিল সাধারণ বিষয়।

কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অনেকেই জীবন্ত কবর দিত। সমাজে ন্যায়বিচার ও মানবতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয়ভাবে মানুষ ইবরাহীম (আ.)–এর প্রকৃত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য একজন নবীর প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তাআলা সেই দায়িত্বের জন্য নির্বাচন করেন মুহাম্মদ ﷺ–কে।

নবুয়তের পূর্বে রাসূল ﷺ–এর জীবন ও চরিত্র

সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা

নবুয়তের আগেই মক্কার মানুষ রাসূল ﷺ–কে “আল-আমীন” (বিশ্বাসী)

ও “আস-সাদিক” (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, কারো হক নষ্ট করতেন না এবং অন্যায়ের সাথে আপস করতেন না।

তাঁর চরিত্র এতই নির্মল ছিল যে, শত্রুরাও তাঁর সততা অস্বীকার করতে পারেনি।

নির্জনতা পছন্দ করা

রাসূল ﷺ ধীরে ধীরে সমাজের অন্যায় ও মূর্তিপূজার প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে শুরু করেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান-চিন্তা ও ইবাদতে সময় কাটাতেন।

তিনি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করতেন। সাথে খাবার নিয়ে যেতেন এবং আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন।

হেরা গুহার এই নির্জন ইবাদত ছিল নবুয়তের পূর্বপ্রস্তুতি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে বিশাল দায়িত্বের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন।

হেরা গুহা-

হেরা গুহার পরিচয়-

হেরা গুহা মক্কার নিকটে জাবালে নূর পর্বতে অবস্থিত। এটি একটি ছোট গুহা, যেখানে বসে মানুষ কাবা শরীফের দিকে তাকাতে পারে।

রাসূল ﷺ প্রায়ই এখানে এসে গভীর চিন্তা করতেন—

মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে,
আকাশ-জমিন সম্পর্কে,
সমাজের অন্যায় সম্পর্কে,
এবং আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে।

এই গুহাতেই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়।
প্রথম ওহি নাযিল, প্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ
পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে।
পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত।
যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।

،اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থঃ পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।
এই আয়াতগুলো ইসলামের জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।
প্রথম নির্দেশই ছিল “পড়ো”। এর মাধ্যমে বোঝা যায় ইসলাম জ্ঞান ও শিক্ষাকে কত বেশি গুরুত্ব দেয়।
রাসূল ﷺ–এর ভয় ও উদ্বেগ — ওহি প্রাপ্তির পরের অবস্থা।
প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ অনুভব করেন। তিনি দ্রুত হেরা গুহা থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বলেন
আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।
তিনি কাঁপছিলেন। কারণ এমন অভিজ্ঞতা তিনি আগে কখনো লাভ করেননি।
এই ঘটনা প্রমাণ করে নবুয়ত কোনো মানুষের কল্পনা বা নিজস্ব দাবি নয়;
বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভূমিকা

সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান

রাসূল ﷺ যখন ভয়ভীত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

তিনি বলেন

আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানদের সম্মান করেন এবং সত্যের পথে সহযোগিতা করেন।

খাদিজা (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।

কঠিন মুহূর্তে তিনি রাসূল ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফল এর সাক্ষ্য

নবুয়তের সত্যতার স্বীকৃতি — খাদিজা (রা.) রাসূল ﷺ-কে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফল-এর কাছে নিয়ে যান।

তিনি তাওরাত ও ইনজিল সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন।

সব কথা শুনে ওয়ারাকা বলেন—

“এ সেই ফেরেশতা, যিনি মূসা (আ.)-এর কাছেও এসেছিলেন।”

তিনি আরও বলেন যে, আপনার জাতি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে।

রাসূল ﷺ আশ্চর্য হয়ে বলেন!

“তারা কি আমাকে বের করে দেবে?”

ওয়ারাকা উত্তর দেন—

যে ব্যক্তি আপনার মতো বার্তা নিয়ে এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।

ওহি বন্ধ হওয়ার সময়কাল

ফাতরাতুল ওহি

প্রথম ওহির পর কিছু সময়ের জন্য ওহি বন্ধ থাকে। এই সময়কে “ফাতরাতুল ওহি” বলা হয়।

এই বিরতিতে রাসূল ﷺ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় ওহির অপেক্ষা করতে থাকেন।

এরপর আল্লাহ তা’আলা সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত নাযিল করেন— আল্লাহ তা'য়ালা বলেন।

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ, قُمْ فَأَنْذِرْ

অর্থ" হে চাদরাবৃত! উঠুন, এবং সতর্ক করুন

এই আয়াতের মাধ্যমে রাসূল ﷺ আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত ও প্রচারের দায়িত্ব লাভ করেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির গুরুত্ব

মানবজাতির মুক্তির সূচনা প্রথম ওহির মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও আলোর নতুন যুগ শুরু হয়।

মানুষ শিরক ও জাহিলিয়াত থেকে মুক্তির পথ পায়।

রাসূল ﷺ–এর নবুয়ত মানবজাতিকে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে নারীকে মর্যাদা দিয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব শিখিয়েছে

এবং আখিরাতের সফলতার পথ দেখিয়েছে।

প্রথম ওহির মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও আলোর নতুন যুগের সূচনা হয়। মানুষ শিরক ও জাহিলিয়াত থেকে মুক্তির পথ পায়। দীর্ঘকাল ধরে মানুষ বিভিন্ন মূর্তি, দেব-দেবী ও কুসংস্কারের পূজায় লিপ্ত ছিল। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তি ও সমাজের ভ্রান্ত রীতিনীতির অনুসরণ করছিল।

এমন অন্ধকার সময়ে রাসূল ﷺ–এর আগমন মানবজাতির জন্য ছিল আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত।

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন; তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাসূল ﷺ–এর নবুয়তের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

জাহিলিয়াত থেকে হিদায়াতের পথে

রাসূল ﷺ–এর নবুয়তের পূর্বে আরব সমাজে ভয়াবহ জাহিলিয়াত বিরাজ করছিল। সমাজে হত্যা, লুটপাট, সুদ, জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার ও নারীর প্রতি চরম অবিচার সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত এবং গরিব-এতিমদের কোনো অধিকার ছিল না।

বিশেষ করে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে অনেকেই লজ্জায় তাদের জীবন্ত কবর দিত। মানবিকতা ও ন্যায়বিচার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিক্ষা দেন যে, সব মানুষ এক আল্লাহর বান্দা এবং সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

তাঁর দাওয়াত মানুষের জীবনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দেয়।

রাসূল ﷺ–এর মাধ্যমে মানুষ অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের দিকে এবং শিরক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসে।

তাওহীদের শিক্ষা প্রদান

রাসূল ﷺ–এর নবুয়ত মানবজাতিকে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা দিয়েছে, তা হলো তাওহীদের শিক্ষা। তিনি ঘোষণা করেন।

তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ।

আরব সমাজে তখন অসংখ্য মূর্তির পূজা করা হতো। কাবা ঘরে তিন শতাধিক মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মানুষ পাথর, গাছ, চন্দ্র-সূর্য ও বিভিন্ন দেবতার কাছে সাহায্য চাইত। রাসূল ﷺ এই শিরকের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।

তাওহীদের এই দাওয়াত শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তনই আনেনি; বরং মানুষের আত্মা, চরিত্র ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করেছে। মানুষ বুঝতে শিখেছে যে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাপার্থক্য

রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের অন্যতম বড় অবদান ছিল সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম আগমনের পূর্বে ধনী ও ক্ষমতাবানরা সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং দুর্বলরা ছিল নির্যাতিত।

রাসূল ﷺ ঘোষণা করেন যে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। তিনি বিচারকার্যে আত্মীয়-স্বজন ও ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো করতেন না।

তিনি বলেন—

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হতো।"

এই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীকে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের মাধ্যমে নারীরা নতুন জীবন ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলাম নারীদের শিক্ষা, উত্তরাধিকার, সম্পদের অধিকার ও সামাজিক সম্মান প্রদান করে।

যে সমাজে কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই সমাজেই ইসলাম কন্যা সন্তানকে রহমত হিসেবে ঘোষণা করে।

রাসূল ﷺ বলেন—

যে ব্যক্তি দুই কন্যা সন্তানকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করবে, সে জান্নাতে আমার নিকটবর্তী হবে।"

নবুয়তের মাধ্যমে নারীকে ভোগের বস্তু নয়; বরং সম্মানিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা

প্রথম ওহির প্রথম শব্দই ছিল "পড়ো" এর মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে।

রাসূল ﷺ মানুষকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব।

তিনি বলেন—

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

নবুয়তের মাধ্যমে পৃথিবীতে এমন এক সভ্যতার সূচনা হয়, যা জ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে মুসলিমর চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়।

আখিরাতের সফলতার পথ দেখানো

রাসূল ﷺ মানুষকে শুধু দুনিয়ার সফলতার পথই দেখাননি বরং আখিরাতের মুক্তির পথও দেখিয়েছেন তিনি শিক্ষা দেন যে, এই পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

আখিরাতের এই বিশ্বাস মানুষের জীবনে দায়িত্ববোধ, তাকওয়া ও নৈতিকতা সৃষ্টি করে। মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং সৎকর্মে উৎসাহিত হয়।

বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত

রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোত্রের জন্য ছিল না; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল।

তিনি ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আরব-অনারব সবার জন্য সমানভাবে শান্তি, ন্যায় ও মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন। তাঁর শিক্ষা মানবসভ্যতাকে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সময়ে আগমন করেন, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি অন্যায়, বৈষম্য ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন এবং ঘোষণা করেন যে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা ও একে অপরের ভাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় রহমত ও দয়ার উজ্জ্বল উদাহরণে ভরপুর। তায়েফের লোকেরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করলেও তিনি তাদের ধ্বংসের বদলে হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রহমত শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি পশুপাখির প্রতিও সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট যুগের জন্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক। তাঁর শিক্ষা ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, সামাজিক সাম্য, পারিবারিক বন্ধন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

মক্কী জীবন ও দাওয়াত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তী জীবনের প্রথম ১৩ বছর (৬১০-৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ) মক্কী জীবন নামে অভিহিত। এই যুগটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন, প্রতিকূল এবং ভিত্তিমূল নির্মাণের সময়।

মক্কী জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, জাহেলিয়াতের কুসংস্কার দূরীকরণ এবং একত্ববাদের (তাওহীদ) ওপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ দল গঠন করা। মানবতার ইতিহাসে এমন কষ্ট, ত্যাগ ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়, যেমনটি দেখা যায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর মক্কী জীবনে। নবুয়তের পর থেকে দীর্ঘ তেরোটি বছর তিনি এমন এক সমাজে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, যেখানে সত্য বলা ছিল অপরাধ, তাওহীদের কথা বলা ছিল বিদ্রোহ।

আর আল্লাহর পথে চলা ছিল নির্যাতনের কারণ যে মক্কা একসময় তাঁকে “আল-আমীন” বলে সম্মান করত, সেই মক্কাই নবুয়তের পরে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। প্রিয় জন্মভূমি তাঁকে কষ্ট দেয়, অপমান করে, রক্তাক্ত করে কিন্তু তবুও তিনি মানুষের জন্য রহমত হয়েই থেকেছেন।

মক্কী জীবন শুধু ইতিহাস নয়; এটি ধৈর্যের অশ্রু, ত্যাগের কাহিনী এবং আল্লাহর উপর অবিচল ভরসার এক উজ্জ্বল দলিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনের মক্কী যুগ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই সময়কাল ছিল তাওহীদের দাওয়াত, ধৈর্য, ত্যাগ, ঈমানের পরীক্ষা এবং মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আহ্বানের যুগ। নবুয়ত লাভের পর থেকে হিজরত পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থান করেন এবং ইসলামের বাণী প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি অসংখ্য কষ্ট, নির্যাতন ও বাধার সম্মুখীন হন, কিন্তু কখনো সত্য প্রচার থেকে বিরত হননি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

“আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।”

মক্কার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কা ছিল আরব উপদ্বীপের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। কাবা শরীফ-এর কারণে মক্কার বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র সেখানে সমবেত হতো। কিন্তু ইবরাহীম (আ.)-এর তাওহীদের শিক্ষা ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সমাজে শিরক, কুসংস্কার, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বৈষম্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই অন্ধকার যুগকেই ইতিহাসে "আইয়্যামে জাহিলিয়াত" বলা হয়।

আরববাসীরা শত শত মূর্তির পূজা করত। কা'বা শরীফেও বহু মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। অথচ ইবরাহীম (আ.)-এর তাওহীদের শিক্ষা তারা ভুলে গিয়েছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের ধর্ম সময়ের প্রবাহে বিকৃত হয়ে যায়। মক্কার মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাঁর ইবাদতে বিভিন্ন মূর্তি ও দেব-দেবীকে শরিক করত।কাবাঘরের চারপাশে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এর মধ্যে হুবল, লাত, উযযা ও মানাত ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মূর্তিপূজা, সুদ, জুয়া, মদপান, ব্যভিচার, গোত্রীয় সংঘাত এবং দুর্বলদের ওপর অত্যাচার ছিল সাধারণ বিষয়। নারী সমাজ ছিল চরম অবহেলিত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অনেকেই তাকে জীবন্ত কবর দিত।

এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মুহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।

নবুয়ত লাভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়সে মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় ইবাদতরত অবস্থায় প্রথম ওহী লাভ করেন। ফেরেশতা জিবরীল (আ.) তাঁর কাছে এসে বলেন— "ইকরা" অর্থাৎ "পড়ুন"।

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে

আরেক বর্ণনায় এসেছে—

"জিবরীল (আ.) এসে বললেন, 'পড়ুন!'"

এই ঘটনার মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা হয় এবং ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়।

গোপন দাওয়াতের যুগ

নবুয়তের পর প্রথম তিন বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি প্রথমে নিজের পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন—

হযরত খাদিজা (রা.)

হযরত আলী (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.)

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)

হযরত আলী (রা.) বলেন—

“আমি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম কিশোর ছিলাম।”

এই সময় মুসলমানরা গোপনে দারুল আরকামে সমবেত হয়ে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। দারুল আরকাম ছিল ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র।

প্রকাশ্য দাওয়াত

তিন বছর পর আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশদের একত্রিত করেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তিনি আল্লাহর রাসূল।

কিন্তু কুরাইশ নেতারা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

বিশেষ করে আবু জাহল ও আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়

নির্যাতন ও অত্যাচার

ইসলামের দাওয়াত যত বিস্তৃত হতে থাকে, মুশরিকদের নির্যাতনও তত বৃদ্ধি পায়। দুর্বল মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়।

হযরত বিলাল (রা.)-কে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখা হতো। ইয়াসির পরিবারকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) বলেন—

“আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে বললেন।

“হাবশায় হিজরত

নির্যাতন অসহনীয় হয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সাহাবীকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন। সেখানে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নাজ্জাশীর শাসনে মুসলমানরা নিরাপদে বসবাস করেন।

এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত হিসেবে পরিচিত।

বয়কট ও দুঃখের বছর

কুরাইশরা বনি হাশিম গোত্রের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করে। মুসলমানদের শি‘বে আবি তালিবে প্রায় তিন বছর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) এবং চাচা আবু তালিবকে হারান। এই বছরকে “আমুল হুযন” বা দুঃখের বছর বলা হয়।

তায়েফ সফর

মক্কার মানুষ ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে যান। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে আহত করে।

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তায়েফের দিনের চেয়ে কঠিন দিন আমার জন্য আর ছিল না।”

তবুও তিনি তাদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করেন। এটি তাঁর মহান চরিত্র ও দয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মিরাজের ঘটনা

দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিরাজের মহান নেয়ামত দান করেন। তিনি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা এবং সেখান থেকে সপ্ত আসমানে গমন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

তারপর আমার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়।

মদীনায় ইসলামের প্রসার ও হিজরত

ইসলামের প্রাথমিক প্রসার মক্কার মায়ুস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক হজের মৌসুমে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মাধ্যমেই মদীনায় (তৎকালীন ইয়াসরিব) ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

আকাবার বাইআতের মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে।

কুরাইশদের অত্যাচার ও হত্যার ষড়যন্ত্র বেড়ে গেলে, আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করেন। এই হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

নির্যাতন ও সাহাবিদের ত্যাগ

ইসলামের সূচনালগ্ন ছিল অত্যন্ত কঠিন ও পরীক্ষাময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন কুরাইশ নেতারা বুঝতে পারে যে এই দাওয়াত তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য হুমকি। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করে। বিশেষ করে যারা দুর্বল, গরীব, দাস কিংবা গোত্রীয়ভাবে অসহায় ছিলেন, তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা ছিল অকল্পনীয়।

কিন্তু ঈমানের শক্তি তাদের অন্তরকে এমন দৃঢ় করেছিল যে তারা নির্যাতনের মুখেও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" থেকে পিছপা হননি। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর এই ত্যাগ ও ধৈর্য ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)-এর অবর্ণনীয় নির্যাতন ও ঈমানের দৃঢ়তা

বেলাল ইবনে রাবাহ: ছিলেন একজন হাবশী কৃষ্ণাঙ্গ দাস। তাঁর মনিব ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু উমাইয়া ইবনে খালাফ। বিলাল (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন থেকেই তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু হয়।

মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে দুপুরের প্রখর রোদে তাঁকে কাপড়হীন অবস্থায় ফেলে রাখা হতো। জ্বলন্ত বালুর তাপে শরীর পুড়ে যেত। এরপর তাঁর বুকের উপর বিশাল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন।

আর উমাইয়া বলত—"মুহাম্মাদের দ্বীন ত্যাগ করো! লাত ও উজ্জার ইবাদত করো! কিন্তু বিলাল (রাঃ)-এর জবান থেকে বের হতো একটিই শব্দ—

"আহাদ! আহাদ!"

“আল্লাহ এক! আল্লাহ এক!”

প্রতিদিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। কখনো তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু জাহেল এবং বিলালের মনিব উমাইয়্যা ইবনে খালাফ হযরত বেলাল (রা.)-এর গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার দুষ্ট ও অবুঝ শিশুদের) হাতে সঁপে দিত।

শিশুরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পুরো শহর ঘুরাতো। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে যেত, কিন্তু তিনি ঈমান থেকে ফিরে আসেননি।

এই দৃশ্য দেখে আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয় কেঁপে ওঠে। তিনি উমাইয়ার কাছে গিয়ে অনেক মূল্য দিয়ে বিলাল (রাঃ)-কে কিনে মুক্ত করে দেন।

পরবর্তীতে এই নির্যাতিত দাসই ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত আযান মদিনার আকাশে ধ্বনিত হতো।

ইয়াসির পরিবারের নির্মম কাহিনী ইসলামের প্রথম শহীদ পরিবার।

ইয়াসরিব ইবনে আমির- ছিলেন ইয়েমেন থেকে আগত এক অসহায় ব্যক্তি।

তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত(রা:)এবং ছেলে আম্মার বিন ইয়াসরি সহ পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেন।

তারা ছিল দুর্বল ও গোত্রহীন। তাই কুরাইশরা তাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাত। প্রতিদিন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর তাদের বেঁধে রাখা হতো। শরীরে লোহার বর্ম পরিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

আবু জাহল বিশেষভাবে সুমাইয়া (রাঃ)-এর উপর ক্ষিপ্ত ছিল। কারণ একজন বৃদ্ধা নারী হয়েও তিনি ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। কিন্তু তখন মুসলিমরা ছিল দুর্বল। তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন—

“হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান জান্নাত।” একদিন আবু জাহল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সুমাইয়া (রাঃ)-কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে শহীদ করে দেয়। এভাবেই তিনি ইসলামের প্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ইয়াসির (রাঃ) নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। আর আম্মার (রাঃ)-কে এত নির্যাতন করা হয়েছিল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)-এর জ্বলন্ত পরীক্ষার কাহিনী।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের একেবারে শুরুর দিকের মুসলিম।

৬ষ্ঠ মুসলিম তিনি তখন মক্কায় তরবারি তৈরির কাজ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, খাব্বাব (রাঃ) তখনই তাঁর কথা শোনেন।

তিনি নবীজী (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন।

খাব্বাব বিন আল-আরাত ছিলেন একজন লৌহকার। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মালিক তাঁকে ভয়াবহ শাস্তি দিত।

একদিন আগুনে কয়লা জ্বালিয়ে তা লাল করে ফেলা হয়। এরপর তাঁকে সেই জ্বলন্ত কয়লার উপর চিত করে শুইয়ে দেওয়া হয়। একজন ব্যক্তি তাঁর বুকের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে রাখত, যাতে তিনি উঠতে না পারেন।

কয়লার আগুনে তাঁর পিঠের মাংস পুড়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর পিঠে সেই পোড়া দাগ দেখা যেত। এই কঠিন অবস্থায় একদিন তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন—

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্যের দোয়া করবেন না?

তখন রাসূল ﷺ পূর্ববর্তী উম্মতের ঈমানদারদের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন—

তোমাদের পূর্বে এমন লোক ছিল যাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হতো, তবুও তারা দ্বীন থেকে ফিরে যেত না। এর মাধ্যমে তিনি সাহাবিদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার শিক্ষা দেন।

আবু বকর (রাঃ)-এর ত্যাগ ও আত্মদান।

আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর নিজের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবকিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন।

তিনি ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু ইসলামের জন্য তিনি নিজের সম্পদ ব্যয় করতে দ্বিধা করেননি। নির্যাতিত মুসলিম দাসদের মুক্ত করার জন্য তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। বিলাল (রাঃ), আমির ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)সহ অনেককে তিনি মুক্ত করেন। যখন মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩৮ জন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) কাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তাওহীদের ভাষণ দেন। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খতিব।

একদিন তিনি কাবার সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করেন। এতে কুরাইশরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাফের নেতা উতবা ইবনে রাবিয়া জুতা দিয়ে তাঁকে এত মারধর করে যে তাঁর মুখমণ্ডল ফুলে যায় এবং চেহারা চেনা যাচ্ছিল না।

লোকেরা ধারণা করেছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল—

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন?"

এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ

যখন কুরাইশরা দেখল নির্যাতন করেও মুসলিমদের ঈমান দুর্বল করা যাচ্ছে না, তখন তারা রাসূল ﷺ ও বনু হাশিম গোত্রকে সম্পূর্ণ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

একটি চুক্তিপত্র লিখে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে উল্লেখ ছিল—

কেউ মুসলিমদের সাথে বিয়ে করবে না

ব্যবসা করবে না

কথা বলবে না

খাদ্য বিক্রি করবে না

এর ফলে মুসলিমরা শি'বে আবি তালিব নামক উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই অবরোধ প্রায় তিন বছর স্থায়ী ছিল।

খাবারের অভাবে শিশুদের কান্নার শব্দ দূর থেকে শোনা যেত। অনেক সময় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হতো। চামড়া সিদ্ধ করেও খাওয়া হয়েছে।

তবুও রাসূল ﷺ ও সাহাবিরা দ্বীন থেকে ফিরে যাননি।

হিজরত

মানবজাতির ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে, যা শুধু একটি জাতি বা সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা, ত্যাগ ও সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের ইতিহাসে "হিজরত" তেমনই এক মহান ও ঐতিহাসিক অধ্যায়। এটি শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়; বরং ঈমান রক্ষা, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার কষ্ট, নির্যাতন ও আপনজনের মায়া ত্যাগ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে শুরু করেন, তখন মক্কা-র কুরাইশরা তাঁর এবং সাহাবীগণের উপর কঠোর নির্যাতন চালায়। ঈমানদারদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার

নির্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মদিনা-র উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। এই হিজরত ইসলামের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা করে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও ইসলামী সমাজব্যবস্থা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক বড়।"

মক্কার নির্যাতন

রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াত লাভের পর মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু কুরাইশ নেতারা ইসলামকে নিজেদের ক্ষমতা ও ধর্মের জন্য হুমকি মনে করে মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করে।

দাস, গরিব ও দুর্বল মুসলমানদের বিশেষভাবে নির্যাতন করা হতো। হযরত বিলাল (রা.)-কে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখা হতো, হযরত ইয়াসির (রা.) ও তাঁর পরিবারকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ

কুরাইশরা মুসলমান ও বনু হাশিম গোত্রকে সমাজচ্যুত করে। তাদের সাথে কেনাবেচা, বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা দীর্ঘদিন শি'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ অবস্থায় কষ্টে জীবনযাপন করেন।

আকাবার বাইআত ও হিজরতের প্রস্তুতি

মদিনা থেকে আগত কিছু লোক ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদিনায় আসার আহ্বান জানান। পরে "বাইআতে আকাবা" সংঘটিত হয়, যেখানে মদিনাবাসীরা ইসলাম রক্ষা ও রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেন। সাহাবীগণ গোপনে মদিনায় যেতে শুরু করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত

ইসলামের ইতিহাসে হিজরত (মক্কা থেকে মদিনা) ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘ তেরো বছর মক্কায় দাওয়াত, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করার পর আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

এই হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং মুসলমানরা স্বাধীনভাবে দ্বীন পালন করার সুযোগ লাভ করে।

যখন কুরাইশ নেতারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে এবং মুসলমানরা মদিনায় শক্ত অবস্থান গড়ে তুলছে, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। দারুন নাদওয়ায় কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিটি গোত্র থেকে একজন শক্তিশালী যুবক নেওয়া হবে এবং সবাই একসাথে আক্রমণ করবে।

হত্যার ষড়যন্ত্র কুরাইশ নেতারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করবে। বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের নিয়ে তারা পরিকল্পনা করে, যাতে হত্যার দায় কোনো এক গোত্রের উপর না আসে। যখন কুরাইশ নেতারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে এবং মুসলমানরা মদিনায় শক্ত অবস্থান গড়ে তুলছে, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে।

দারুন নাদওয়ায় কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিটি গোত্র থেকে একজন শক্তিশালী যুবক নেওয়া হবে এবং সবাই একসাথে আক্রমণ করে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করবে, যাতে হত্যার দায় কোনো এক গোত্রের উপর না আসে।

হযরত আলী (রা.)-এর আত্মত্যাগ

আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন, যাতে বাইরে অবস্থানরত কুরাইশরা মনে করে তিনি এখনো ঘরে আছেন।

হযরত আলী (রা.) জীবনের ঝুঁকি নিয়েও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পালন করেন। এটি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে হিজরতের যাত্রা শুরু করেন। আবু বকর (রা.) দীর্ঘদিন ধরেই এই সৌভাগ্যের অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূল ﷺ যখন তাঁকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেন, তখন আনন্দে তাঁর চোখে অশ্রু চলে আসে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেনঃ

"আমি কখনো কাউকে আনন্দে কাঁদতে দেখিনি, যেভাবে আবু বকর (রা.) সেদিন কেঁদেছিলেন।"

গারে সাওরে আশ্রয়

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জাবালে সাওর পর্বতের একটি গুহায় গারে সাওর-এ আত্মগোপন করে তিন রাত আশ্রয় নিয়েছিলেন। মক্কার পবিত্র কাবা শরীফ থেকে প্রায় ৪ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে সাওর পর্বতে এই গুহাটি অবস্থিত

কুরাইশরা তাঁদের খুঁজতে চারদিকে লোক পাঠায়। এমনকি অনুসন্ধানকারীরা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন আবু বকর (রা.) ভয় পেয়ে বলেন, "তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে তাকায়, তবে আমাদের দেখে ফেলবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ় ঈমানের সাথে বলেনঃ

"চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

আল্লাহর অশেষ কুদরতে গুহার মুখে মাকড়সার জাল ও কবুতরের বাসা দেখে কুরাইশরা মনে করল, এখানে কেউ প্রবেশ করেনি। ফলে তারা ফিরে যায়।

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৯০৬ (হিজরত অধ্যায়)।

মদিনার পথে যাত্রা

তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.) একজন দক্ষ পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা করেন। পথে বহু কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

সুরাকা ইবনে মালিকের ধাওয়া ও ঘোড়া দেবে যাওয়া

মক্কার কাফেররা ঘোষণা করেছিল যে, রাসুল (সা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরতে পারলে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকা ইবনে মালিক নামক এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বর্শা ও ঘোড়া নিয়ে তাঁদের পিছু নেয়।

সে যখন রাসুল (সা.)-এর একদম কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। সাথে সাথে অলৌকিকভাবে সুরাকার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত শক্ত বালিতে দেবে যায় এবং সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে।

তখন সুরাকা বুঝতে পারে যে কোনো আসমানী শক্তি রাসুল (সা.)-কে রক্ষা করছে। পরে সে নিরাপত্তা চেয়ে ফিরে যায়।

(সুরাকা ইবনে মালিকের নিজের জবানবন্দিতে এই অলৌকিক ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত)

এক পর্যায়ে সুরাকা ইবন মালিক রাসূল ﷺ-কে ধরার উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুসরণ করে। কারণ কুরাইশরা রাসূল ﷺ-কে ধরিয়ে দিলে বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তার ঘোড়া বারবার মাটিতে ধসে যায়। তখন সে বুঝতে পারে, রাসূল ﷺ আল্লাহর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। পরে সে নিরাপত্তা চেয়ে ফিরে যায়।

কুবায় আগমন

দীর্ঘ যাত্রার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মদিনার নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে পৌঁছান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং ইসলামের প্রথম মসজিদ মসজিদে "কুবা" নির্মাণ করেন।

হিজরতের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত আমাদের বহু শিক্ষা দেয়—

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

সত্যের পথে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

ধৈর্য ও ঈমানের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতিও অতিক্রম করা যায়।

দ্বীনের স্বার্থে প্রয়োজনে নিজের ঘরবাড়ি ও স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন প্রেরণা, ত্যাগ ও ঈমানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মদিনায় ইসলামী সমাজ গঠন

মহানবী ﷺ-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত শুধু স্থান পরিবর্তনের ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল ইসলামী সভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের সূচনা। মদিনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ঈমান, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা এবং আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ। দীর্ঘ তেরো বছরের দাওয়াত, নির্যাতন, বয়কট ও অসংখ্য কষ্টের পর অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। মক্কার বালুকাময় পথ পেরিয়ে যখন তিনি মদিনার ভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন শুধু একজন নবীর আগমন হয়নি; বরং পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। এমন এক

সমাজ, যেখানে মানুষ মানুষকে রক্ত, বংশ কিংবা সম্পদের কারণে নয়; বরং ঈমান ও তাকওয়ার কারণে মূল্যায়ন করত। মদিনা ছিল বহু গোত্র, মত ও সংঘাতের নগরী। সেখানে ছিল আউস ও খাযরাজের গোত্র দীর্ঘদিনের শত্রুতা, ইহুদিদের প্রভাব, সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বিভক্ত জনপদকে আল্লাহর কালিমার ছায়াতলে এনে এমন এক সমাজে রূপান্তর করেন, যার প্রতিটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে ছিল ন্যায়, দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহভীতির উপর। মক্কার দীর্ঘ তেরো বছরের দাওয়াত ছিল কষ্ট, ধৈর্য ও ত্যাগের ইতিহাস রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের হৃদয়ে তাওহীদের আলো পৌঁছে দিতে গিয়ে সহ্য করেছেন উপহাস, নির্যাতন, অবরোধ ও প্রিয়জন হারানোর বেদনা। সাহাবিরাও ছিলেন সীমাহীন পরীক্ষার মধ্যে। কেউ আগুনের ওপর শুয়েছেন, কেউ বালুর উত্তাপে পুড়েছেন, কেউ নিজ ভূমি ছেড়ে হাবশায় হিজরত করেছেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা মদিনার দরজা খুলে দিলেন। ইয়াসরিব নামের সেই শহর একসময় রক্তপাত, গোত্রীয় সংঘর্ষ ও অশান্তির নগরী ছিল। আউস ও খাযরাজের যুদ্ধ বহু বছর ধরে তাদের ক্লান্ত করে তুলেছিল। মানুষ এমন একজন নেতার অপেক্ষায় ছিল, যিনি তাদের বিভক্ত হৃদয়গুলোকে একত্র করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় প্রবেশ করেন, তখন শিশুরা আনন্দে গান গেয়েছিল—

“তলা‘আল বাদরু ‘আলাইনা...

(পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে আমাদের উপর।)

এ যেন শুধু একজন মানুষের আগমন ছিল না; বরং রহমত, ন্যায় ও হিদায়াতের আগমন ছিল।

মসজিদে নববী নির্মাণ সমাজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

মদিনায় আগমনের পর রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এটি শুধু ইবাদতের স্থান ছিল না; বরং রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষা, বিচারকার্য, পরামর্শ সভা, অতিথি আপ্যায়ন এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। মসজিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

মদিনায় পৌঁছানোর পর রাসূল ﷺ প্রথমে কুবায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি “মসজিদে কুবা” নির্মাণ করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদ।

এরপর তিনি মদিনার মূল অংশে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট “কাসওয়া” মদিনায় প্রবেশের পর বনু নাজ্জার গোত্রের এলাকায় একটি খালি জায়গায় বসে পড়ে। রাসূল ﷺ বুঝতে পারেন, এ স্থানই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

সেই জমির মালিক ছিল দুই এতিম বালক— “সাহল” ও “সুহাইল”
তারা আসআদ ইবনে যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে ছিল।
জমিটিতে কিছু খেজুর গাছ, পুরনো কবর এবং খেজুর শুকানোর স্থান ছিল।
সাহাবিরা জমিটি বিনামূল্যে রাসূল ﷺ-কে দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। বরং মূল্য পরিশোধ করে জমিটি ক্রয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেন যে ইসলামী সমাজ অন্যের হক দখল করে প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং ন্যায় ও বৈধতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।
আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—
“জমিটি ছিল দুই এতিম বালকের, যারা বনু নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।”
সেই স্থান নির্বাচন করা হয় মসজিদে নববীর জন্য। নির্মাণকাজে রাসূল ﷺ নিজ হাতে অংশ নেন। মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে ইট ও মাটি বহন করেন। সাহাবিগণও তাঁর সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। তিনি শুধু নির্দেশদাতা ছিলেন না; বরং নিজে শ্রম দিয়ে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন— নেতৃত্ব মানে মানুষের উপরে দাঁড়িয়ে আদেশ করা নয়, বরং তাদের সঙ্গে কষ্ট ভাগ করে নেওয়া।
সাহাবিগণ কাজ করতে করতে আবেগভরে কবিতা পড়ছিলেন—
“হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন।
অতএব আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।”
রাসূল ﷺ-ও তাদের সঙ্গে সেই কথাগুলো পড়ছিলেন।
নবী ﷺ নিজ হাতে ইট বহন করছিলেন। এই দৃশ্য সাহাবিদের হৃদয়ে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিলেন— এই মসজিদ কেবল ভবন নয়; এটি একটি নতুন উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। সাহাবিগণ ইট বহন করছিলেন, আর রাসূল ﷺ-ও তাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাঁকে দেখে সাহাবিদের ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।
মসজিদে নববী ছিল—
ইবাদতের কেন্দ্র,
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
আদালত,
শুরা পরিষদ,
সামরিক পরিকল্পনার কেন্দ্র,

দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল। এখানেই “আহলুস সুফফা”র সাহাবিরা থাকতেন। তারা ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, জ্ঞানপিপাসু মানুষ; যাদের জীবন কুরআন ও দ্বীনের জন্য উৎসর্গিত ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

“রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় এসে মসজিদ নির্মাণ করেন।”

মসজিদে নববী অত্যন্ত সরলভাবে নির্মিত হয়েছিল। দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের, ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল ও পাতা দিয়ে তৈরি, আর স্তম্ভগুলো ছিল খেজুর গাছের কাণ্ড। মেঝেতে বালু ও পাথর বিছানো ছিল। বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে পানি পড়ত। কিন্তু সেই সরল মসজিদ থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের গড়ে তোলা হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে— ইসলামের শক্তি বাহ্যিক জাঁকজমকে নয়; বরং ঈমান, ইখলাস ও তাকওয়ায়।

মসজিদে নববী ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের হৃদয়। এখানে শুধু সালাত আদায় হতো না; বরং মুসলিম সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালিত হতো।

মসজিদে নববী ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের হৃদয়। এখানে শুধু সালাত আদায় হতো না বরং মুসলিম সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালিত হতো।

প্রথমত এটি ছিল আল্লাহর ইবাদতের স্থান। মুসলমানরা এখানে জামাআতে সালাত আদায় করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর স্মরণে নিজেদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করতেন।

মসজিদে নববী ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই সাহাবিগণ কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

“আহলুস সুফফা” নামে একদল দরিদ্র সাহাবি মসজিদেই অবস্থান করতেন। তারা দিন-রাত জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকতেন।

রাসূল ﷺ বলেন—তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।

আউস ও খাযরাজের শত্রুতার অবসান

মদিনার সবচেয়ে বড় সংকট ছিল অভ্যন্তরীণ বিভক্তি। আউস ও খাযরাজ গোত্র বহু বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। “বু‘আস” যুদ্ধ তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের মাধ্যমে তাদের হৃদয় একত্র করেন। যারা একসময় পরস্পরের রক্ত ঝরাত, তারা এখন একই কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করত। এটি ছিল ইসলামের অলৌকিক পরিবর্তনের অন্যতম নিদর্শন।

মুহাজির ও আনসারের ভ্রাতৃত্ব

রাসূল ﷺ মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সঙ্গে মদিনার আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এটি শুধু আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না; বরং বাস্তব জীবনের অংশীদারিত্ব ছিল।

আনসাররা মুহাজিরদের জন্য নিজেদের ঘর খুলে দেন। কেউ নিজের সম্পদের অর্ধেক ভাগ করতে চেয়েছেন, কেউ জমি দিয়েছেন, কেউ ব্যবসায় অংশীদার করেছেন।

সা'দ ইবনে রাবী' রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—

"আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব।"

কিন্তু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেছিলেন—

"আপনি শুধু আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।"

এই ঘটনা মুসলিম সমাজে আত্মসম্মান, সহযোগিতা ও ভালোবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মদিনা সনদ পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধানগুলোর একটি

মদিনায় মুসলিম, ইহুদি এবং বিভিন্ন গোত্রের লোক বসবাস করত। তাদের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাসূল ﷺ "মদিনা সনদ" প্রণয়ন করেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত।

এই সনদের মাধ্যমে—

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।

সকল নাগরিকের অধিকার নির্ধারণ করা হয়।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সম্মিলিত দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।

অন্যায় ও অপরাধ দমনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়

এই সনদে উল্লেখ ছিল—

প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবাই একত্র হবে,

মদিনা হবে সম্মিলিত নিরাপত্তার নগরী,

কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

এটি প্রমাণ করে ইসলাম কখনো বিশৃঙ্খলা চায় না; বরং ন্যায়ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করে।

ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্র গঠন

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, কেবল আইন দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়; মানুষের অন্তর পরিবর্তন করতে হবে। তাই তিনি সাহাবিদের ঈমান, আখলাক ও জ্ঞানে গড়ে তুলতে শুরু করেন।

মসজিদে নববীতে নিয়মিত কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো। সাহাবিরা শুধু আয়াত মুখস্থ করতেন না; বরং জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

"আমরা ঈমান শিখেছি কুরআনের আগে।"

অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সাহাবিরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হন।

রাসূল ﷺ বলেন— "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

অর্থনৈতিক সংস্কার ও মানবিক সমাজ

মদিনার ইসলামী সমাজে সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান ছিল। ধনী-গরিব, আরব-অনারব, শাসক-শাসিত—সবার জন্য একই বিচারব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল। রাসূল ﷺ বলেন—

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো, আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হতো।"

তখন জাহেলী সমাজে সুদ, প্রতারণা ও দুর্বলদের শোষণ ছিল সাধারণ বিষয়। রাসূল ﷺ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

রাসূল ﷺ তিনি —

যাকাত ব্যবস্থা চালু করেন,

সুদ হারাম ঘোষণা করেন,

সততা ও আমানতদারিকে উৎসাহ দেন,

দরিদ্রদের হক নিশ্চিত করেন।

মদিনার বাজারে একদিন রাসূল ﷺ খাদ্যের স্তূপে হাত ঢুকিয়ে ভেতরে ভেজা অংশ দেখতে পান। তখন তিনি বলেন—

"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

নারীর মর্যাদা ও পারিবারিক সমাজব্যবস্থা

ইসলাম আগমনের আগে নারীরা ছিল অত্যাচারিত। কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ইসলাম এসে নারীদের সম্মান, উত্তরাধিকার, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা দেয়। রাসূল ﷺ পরিবারকে ইসলামী সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন এবং উম্মতকেও সেই শিক্ষা দেন।

রাসূল ﷺ বলেন—

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

আত্মরক্ষা ও ইসলামী সমাজ সংরক্ষণ

মদিনায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। মক্কার কুরাইশরা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে মেনে নিতে পারেনি। তারা বারবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হামলা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষা এবং নবগঠিত ইসলামী সমাজকে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ইসলাম কখনো আগ্রাসনকে সমর্থন করে না; বরং শান্তি, ন্যায়বিচার ও আত্মরক্ষার শিক্ষা দেয়। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কুরাইশরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। তখন মুসলমানদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। মক্কা জীবনে মুসলমানরা দীর্ঘ ১৩ বছর নির্যাতন সহ্য করলেও যুদ্ধের অনুমতি পাননি। কিন্তু মদিনায় এসে যখন মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন।

বদর যুদ্ধ, আত্মরক্ষার প্রথম বড় পরীক্ষা ছিলো - হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামী সমাজ সংরক্ষণের প্রথম বড় পরীক্ষা। কুরাইশরা মুসলমানদের ধ্বংস করতে এগিয়ে এলে মুসলমানরা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন —

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।"

বদরের বিজয় মুসলিম সমাজকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।

উহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ধৈর্য, আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার শিক্ষা বহন করে। অপরদিকে খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা নতুন কৌশল গ্রহণ করে আত্মরক্ষার এক অনন্য

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সালমান আল-ফারিসি (রাঃ)-এর পরামর্শে শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা হয়, যা শত্রুর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে।
এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে আত্মরক্ষার জন্য কৌশল, পরিকল্পনা এবং প্রজ্ঞার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বদর যুদ্ধ ছিল ঈমানের বিজয়। উহুদ ছিল ধৈর্যের শিক্ষা। খন্দক ছিল কৌশল ও ঐক্যের নিদর্শন।

পারিবারিক জীবন (স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মানবজাতির জন্য শিক্ষার উৎস। তিনি যেমন ছিলেন একজন মহান নবী, তেমনি ছিলেন একজন স্নেহময় স্বামী, দয়ালু পিতা এবং আদর্শ পরিবারের কর্তা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর পারিবারিক জীবন শুধু ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ নয়; বরং এটি ছিল একটি বাস্তব শিক্ষা, যার মাধ্যমে উম্মত শিখেছে— পরিবার কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, ধৈর্য কীভাবে ধারণ করতে হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটি ঘরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করতে হয়।
রাসূল ﷺ-এর ঘরগুলো ছিল অত্যন্ত সাধারণ। কখনো চুলায় আগুন জ্বলত না, দিনের পর দিন শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে সময় কাটত। কিন্তু সেই ঘরগুলোতেই নাজিল হতো ওহী, সেখানেই তিলাওয়াত হতো কুরআন, আর সেখান থেকেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত রহমত, ইলম ও হিদায়াতের আলো।
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—
“মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার কখনো পরপর তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পারেনি।” তবুও সেই ঘরে অভিযোগ ছিল না; বরং ছিল শুকরিয়া, সন্তুষ্টি ও আখিরাতের আশা।
আল্লাহ তাআলা নবীজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে “উম্মাহাতুল মুমিনীন” বা মুমিনদের মাতা হিসেবে সম্মানিত করেছেন। “নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।” নবী ﷺ-এর বিবাহসমূহ কেবল ব্যক্তিগত

জীবনের অংশ ছিল না; বরং এর পেছনে ছিল সামাজিক, শিক্ষামূলক, মানবিক ও দাওয়াতি বহু হিকমাহ।

নবীজির ﷺ পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পারিবারিক জীবন ছিল মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং পরিবারের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল একজন মানুষ। তাঁর ঘর ছিল ভালোবাসা, দয়া, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, ত্যাগ ও আল্লাহভীতির এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। ইসলামের পারিবারিক শিক্ষার বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও সম্মানজনক আচরণ করতেন। তিনি কখনো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না; বরং ভালোবাসা, নম্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতেন। তাঁর আচরণে স্ত্রীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা তৎকালীন আরব সমাজে ছিল বিরল। নবীজি ﷺ-এর পরিবার ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও সাদাসিধে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘরে বিলাসিতা ছিল না। কখনো কখনো মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলত না। খেজুর ও পানি দিয়েই দিন কেটে যেত।

আয়শা রাঃ বলেন—

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার এক মাস পর্যন্ত এমন কাটিয়েছে যে, তাদের ঘরে রান্নার জন্য আগুন জ্বলত না।"

কিন্তু দারিদ্র্য তাঁদের পরিবারে অশান্তি আনতে পারেনি। কারণ সেই ঘরের ভিত্তি ছিল আল্লাহভীতি, সন্তুষ্টি ও পারস্পরিক ভালোবাসা।

স্ত্রীগণ উম্মাহর মায়েরা

আল্লাহ তাআলা নবীজি ﷺ-এর স্ত্রীগণকে "উম্মাহাতুল মুমিনীন" বা মুমিনদের মাতা হিসেবে সম্মানিত করেছেন। নবী ﷺ-এর বিবাহসমূহ কেবল ব্যক্তিগত জীবনের অংশ ছিল না; বরং এর পেছনে ছিল সামাজিক, শিক্ষামূলক, মানবিক ও দাওয়াতি বহু হিকমাহ।

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও মানবিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রাসূল ﷺ একাধিক বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীগণ ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রধান স্ত্রীগণ হলেন—

১. সাওদা বিনতে যামআ

২. আয়িশা বিনতে আবু বকর

৩. হাফসা বিনতে উমর

৪. যয়নব বিনতে খুযাইমা

৫. উম্মে সালামা

৬. যয়নব বিনতে জাহশ

৭. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস

৮. উম্মে হাবিবা

৯. সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই

১০. মায়মুনা বিনতে হারিস

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহসমূহের প্রেক্ষাপট

অনেকে রাসূল ﷺ-এর একাধিক বিবাহকে কেবল সাধারণ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। অথচ তাঁর অধিকাংশ বিবাহের পেছনে ছিল গভীর হিকমাহ, সামাজিক কল্যাণ, বিধবা নারীদের আশ্রয়, গোত্রীয় সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং ইসলামের শিক্ষা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২৫ বছর বয়স থেকে প্রায় ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত রাসূল ﷺ শুধুমাত্র একজন স্ত্রী—খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গেই জীবন কাটিয়েছেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর জীবনের কঠিন সময়গুলোতে তিনি একাধিক বিবাহ করেন, আর তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিধবা বা স্বামীহারা নারী।

এই বিবাহগুলোর মাধ্যমে—

বিধবা নারীরা নিরাপত্তা পেয়েছেন,

বিভিন্ন গোত্র ইসলামের কাছাকাছি এসেছে,

উম্মত পারিবারিক জীবনের বিস্তারিত মাসআলা জানতে পেরেছে,

নারীদের জন্য দ্বীনি জ্ঞান সংরক্ষিত হয়েছে।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ভালোবাসা, ত্যাগ ও সমর্থনের প্রতীক

তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী এবং জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থন।

রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"যখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল।"

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মক্কার সম্মানিত ও ধনী ব্যবসায়ী নারী। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে তিনি রাসূল ﷺ-কে ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরে তাঁর চরিত্র, আমানতদারিতা ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

তখন রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স প্রায় ৪০ বছর।

এই বিবাহ ছিল গভীর ভালোবাসা, সম্মান ও বিশ্বস্ততার এক অপূর্ব উদাহরণ। রাসূল ﷺ কখনো তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি।

ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ

তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম বিশ্বাসী। নিজের সমস্ত সম্পদ ইসলামের পথে ব্যয় করেছিলেন। শি'বে আবি তালিবের কঠিন অবরোধে তিনি ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁর মৃত্যুর বছরকে রাসূল ﷺ "আমুল হুযন" — দুঃখের বছর হিসেবে স্মরণ করতেন।

খাদিজা রাঃ প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা

তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরও রাসূল ﷺ তাঁকে ভুলতে পারেননি। তিনি খাদিজার বান্ধবীদের খোঁজ নিতেন, তাঁর কথা স্মরণ করতেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

"আমি রাসূল ﷺ-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি এত ঈর্ষান্বিত হইনি, যতটা খাদিজার প্রতি হয়েছিলাম।"

রাসূল ﷺ বলতেন—

"তিনি তখন আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল।"

বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা : কঠিন সময়ে সহানুভূতির ছায়া

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ গভীর কষ্টে ছিলেন। তাঁর ঘর ছিল শূন্য, ছোট ছোট সন্তানদের দেখাশোনার প্রয়োজন ছিল। এমন সময়ে সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ঘরে আসেন।

তিনি ছিলেন বিধবা নারী। হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং কষ্টের জীবন পার করেছিলেন। বয়সেও তিনি তরুণী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু।

তিনি রাসূল ﷺ-এর ঘরে শান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তীতে বলেছিলেন—

"আমি এমন নারী খুব কম দেখেছি, যার চরিত্র সাওদার মতো সুন্দর।"

আয়িশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা : জ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় স্ত্রী। তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা।

তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানী ছিলেন। ইসলামের বহু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা তাঁর মাধ্যমে উম্মতের কাছে পৌঁছেছে।

তিনি প্রায় ২২১০টির বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন, তাঁর অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

একবার আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। রাসূল ﷺ সাহাবিদের সামনে এগিয়ে যেতে বললেন, এরপর আয়িশার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। প্রথমবার আয়িশা জিতে যান। পরে কিছুদিন পর রাসূল ﷺ জিতে হেসে বলেছিলেন—

"এটি সেই জয়ের বদলা।"

এখান থেকে বোঝা যায়— ইসলামে দাম্পত্য জীবন শুধু দায়িত্ব নয়; বরং ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সৌন্দর্যের সম্পর্ক।

ইফকের ঘটনা

ইফকের ঘটনা হৃদয়বিদারক পরীক্ষা

ইসলামের ইতিহাসে "ইফকের ঘটনা" ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও শিক্ষণীয় একটি ঘটনা। "ইফক" শব্দের অর্থ হচ্ছে— ভয়াবহ মিথ্যা অপবাদ। এই ঘটনায় মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন -এর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ ছড়িয়েছিল।

অথচ আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দেন।
ঘটনাটি সংঘটিত হয় বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের পর। সফর শেষে কাফেলা যখন ফিরে আসছিল, তখন আয়িশা (রা.) কিছু সময়ের জন্য কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েন। পরে সাহাবি তাঁকে দেখতে পান এবং সম্মানের সাথে কাফেলায় পৌঁছে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের নেতা ভয়াবহ অপবাদ ছড়াতে শুরু করে। কিছু সরলমনা মুসলিমও না বুঝে সেই কথাগুলো প্রচার করে ফেলেন। পুরো মদীনায় অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।
সবচেয়ে কষ্টের বিষয় ছিল— এই অপবাদের কারণে অত্যন্ত ব্যথিত হন। আয়িশা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেছিলেন, এত কান্না করেছিলেন যে মনে হয়েছিল চোখের পানি আর কখনো শুকাবে না।
অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন-নূরের আয়াত নাযিল করেন এবং ঘোষণা দেন যে আয়িশা (রা.) সম্পূর্ণ পবিত্র। এই ঘটনার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে—কোনো সংবাদ যাচাই ছাড়া প্রচার করা ভয়াবহ গুনাহ। মুমিনদের সম্পর্কে সু-ধারণা রাখা ঈমানের অংশ। অপবাদ ও গীবত সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। কঠিন পরীক্ষার পর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। ইফকের ঘটনা শুধু একটি ইতিহাস নয়; এটি আমাদের জবান, চরিত্র ও সামাজিক আচরণের জন্য এক গভীর সতর্কবার্তা।

রাসূল ﷺ-এর সন্তানগণ

রাসূল ﷺ-এর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ছিল অসীম। তিনি শিশুদের কোলে নিতেন, আদর করতেন, কাঁধে বসাতেন।
তাঁর সাতজন সন্তান ছিল।
পুত্রগণ
কাসিম
আবদুল্লাহ
ইবরাহিম
কন্যাগণ
যায়নাব
রুকাইয়্যা

উম্মে কুলসুম

ফাতিমা

ইবরাহিম ছাড়া সকল সন্তান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সবাই শৈশবেই ইন্তিকাল করেন।

কাশিম ইবনে মুহাম্মদ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ।

ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ

রাসূল ﷺ তাঁর সন্তানদের মৃত্যুতেও গভীর ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

যখন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ) ইন্তিকাল করেন, তখন নবীজি ﷺ-এর চোখে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বলেনঃ

"চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় ব্যথিত হয়; কিন্তু আমরা এমন কথা বলি না যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে।

এ ঘটনা আমাদের শেখায় ইসলাম মানুষকে আবেগহীন হতে বলে না বরং ধৈর্য ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে শেখায়।

ফাতিমা (রাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা

ফাতিমা রাঃ ছিলেন নবীজি ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা। তিনি যখন আসতেন, নবীজি ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন, হাতে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। তিনি বলেছেনঃ

"ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা।"

এ আচরণের মাধ্যমে তিনি সমাজকে শিখিয়েছেন—কন্যাসন্তান বোঝা নয়; বরং রহমত।

নাতি-নাতনিদের প্রতি স্নেহ

নবীজি ﷺ তাঁর নাতি হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী -কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি তাঁদের কাঁধে বহন করতেন, চুমু দিতেন এবং স্নেহ করতেন।

একবার এক সাহাবী বললেন, "আমার দশ সন্তান আছে, কিন্তু আমি কখনো কাউকে চুমু দিইনি।" তখন নবীজি ﷺ বললেনঃ

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"

পারিবারিক জীবনে তাকওয়া ও ইবাদত

নবীজি ﷺ-এর পরিবার ছিল ইবাদতমুখর। রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘর কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে আলোকিত থাকত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“হে নবীর পরিবার! তোমরা ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।”

তিনি পরিবারকে নামাজের প্রতি উৎসাহিত করতেন।

পারিবারিক জীবনের শিক্ষা

নবীজি ﷺ-এর পরিবার থেকে আমরা শিখি—

পরিবারে ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রাখতে হবে।

স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতে হবে।

সন্তানদের সময় দিতে হবে ও স্নেহ করতে হবে।

কন্যাসন্তানকে সম্মান করতে হবে।

দারিদ্র্য এলেও ধৈর্য হারানো যাবে না।

পরিবারকে দ্বীনের পরিবেশে গড়ে তুলতে হবে।

ঘরের কাজকে ছোট মনে করা যাবে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সহযোগিতা ও দয়ার ভিত্তিতে।

সাহাবিদের সাথে সম্পর্ক

নবীজি (সা.) সাহাবিদের নিজ পরিবারের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং সাহাবিরাও তাঁকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় মনে করতেন। সাহাবিদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে করেছেন। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। রাসুল (সা.) সাহাবিদের সাথে অত্যন্ত কোমল ও বিনয়ী আচরণ করতেন, কখনো কর্কশভাষী বা কঠোর ছিলেন না। তিনি তাদের

সাথে হাসি-খুশি ও স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতেন, মজলিশে কোনো পার্থক্য রাখতেন না

তিনি সাহাবিদের পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁদের মতামত নিতেন। সাহাবিদের সুখে-দুঃখে রাসুল (সা.) পাশে থাকতেন কেউ অসুস্থ হলে তিনি দেখতে যেতেন, কারও মৃত্যু হলে সান্ত্বনা দিতেন এবং তাদের অভাব-অনটনে সবসময় খোঁজ রাখতেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ভবনের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে

মানব ইতিহাসে এমন সম্পর্ক খুব কমই দেখা যায়, যেখানে একজন নেতা তাঁর অনুসারীদের এত গভীরভাবে ভালোবেসেছেন এবং অনুসারীরাও নিজেদের জীবন, সম্পদ, পরিবার, সবকিছু রাসূল সাঃ-এর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থেকেছেন। রাসূলﷺ - এবং তাঁর সাহাবিদের সম্পর্ক ছিল ঠিক এমনই এক বিস্ময়কর সম্পর্ক—যেখানে ছিল ঈমানের বন্ধন, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আখিরাতমুখী ভ্রাতৃত্ব।

সাহাবিগণ শুধু নবীজি ﷺ-এর কথা শুনতেন না; বরং তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি হাসি-কান্না নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তাঁরা বুঝতেন এই মানুষটি কেবল একজন সাধারণ ব্যক্তি নন; তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল, যাঁর অনুসরণেই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

আর নবীজি ﷺ-ও তাঁদেরকে কেবল অনুসারী হিসেবে দেখেননি। তিনি তাঁদের হৃদয় গড়ে তুলেছেন, ভুল সংশোধন করেছেন, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়েছেন, ক্ষুধায় পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ভালোবাসা দিয়ে এমন এক প্রজন্ম তৈরি করেছেন, যাদের মতো প্রজন্ম পৃথিবী আর কখনো দেখেনি। নবীজি ﷺ-এর সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা এক ঈমানী সমাজ গড়ে উঠে।

সাহাবিদের পরিচয় ও মর্যাদা

“সাহাবি” শব্দটি এসেছে “সুহবত” থেকে, যার অর্থ সঙ্গ বা সাথিত্ব। ইসলামী পরিভাষায় সাহাবি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ঈমান অবস্থায় নবীজি ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

সাহাবিগণ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। কারণ তাঁরা সরাসরি নবীজি ﷺ-এর কাছ থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের জীবন দিয়ে ইসলামের প্রতিটি আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন।

“অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণ এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে— আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।”

নবীজির ﷺ সাহাবিদের প্রতি ভালোবাসা

নবীজি ﷺ সাহাবিদের প্রতি এতটাই দয়ালু ছিলেন যে, তাঁদের সামান্য কষ্টও তাঁকে ব্যথিত করত। কেউ অসুস্থ হলে তিনি দেখতে যেতেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ নিতেন। কেউ দুঃখ পেলে সান্ত্বনা দিতেন। এমনকি দরিদ্র সাহাবিদের ক্ষুধার কষ্টও তিনি অনুভব করতেন। একবার এক সাহাবি ক্ষুধায় পেটের সঙ্গে পাথর বেঁধেছিলেন। নবীজি ﷺ নিজের কাপড় উঠিয়ে দেখালেন—তাঁর পেটেও দুটি পাথর বাঁধা, এ ছিল একজন নেতার সঙ্গে অনুসারীদের নয়, বরং একজন পিতার সঙ্গে সন্তানের মতো সম্পর্ক। ল

আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব

আবু বকর রাঃ- ছিলেন নবীজি ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথী। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নবীজির ﷺ ছায়াসঙ্গী ছিলেন।

যখন সবাই নবীজি ﷺ -কে মিথ্যাবাদী বলছিল, তখন আবু বকর (রাঃ) নির্দ্বিধায় বলেছিলেনঃ “তিনি যদি বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন।”

এই কারণে তিনি “আস-সিদ্দীক” উপাধি লাভ করেন।

হজরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মানুষের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে?

রাসুল (সা.) উত্তরে বলেছিলেন, "আয়েশা।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষদের মধ্যে কে?" রাসুল (সা.) বললেন, "আয়েশার পিতা (আবু বকর)

রাসুল (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব ও অবদানের কথা স্মরণ করে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু (খলিল) হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম।

হিজরতের সময় গুহা সাওরে তাঁদের সেই হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত কুরআনে স্থান পেয়েছে। কাফিররা যখন গুহার দরজায় পৌঁছে যায়, আবু বকর (রাঃ) নবীজির ﷺ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

তখন নবীজি ﷺ বলেন—

“চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।”

এই একটি বাক্য শুধু আবু বকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়নি; বরং পুরো উম্মাহকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দিয়েছে।

উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে, হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে ও পবিত্র কুরআন (সূরা ত্বহা)-এর বাণী শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেন, তাঁর এই আগমনে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছিলেন: "হে আল্লাহ! উমর বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম—এ দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।" আল্লাহ তা'আলা উমর (রাঃ)-কে কবুল করেন

নিজ বোন ফাতেমা (রাঃ) ও ভগ্নিপতির বাড়িতে পবিত্র কোরআনের আয়াত (সূরা ত্বহা)-এর তেলাওয়াত শুনে তাঁর মন পরিবর্তন হয়। তলোয়ার নিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হলেও, কুরআনের ঐশ্বরিক বাণী তাঁর অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি ঈমানের পথে ফিরে আসেন। এরপর তিনি সোজা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন

উমার রাঃ ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলিমদের কঠিন শত্রু ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের শক্তিতে পরিণত হন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণে মুসলিমরা এত আনন্দিত হয়েছিল যে, প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে কাবার সামনে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়।

নবীজি ﷺ তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করেছিলেন—

"হে আল্লাহ! উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আবু জাহল এই দুইজনের একজনের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"

উমর (রাঃ) ছিলেন সত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু নবীজি ﷺ -এর সামনে তিনি ছিলেন বিনয়ী ছাত্রের মতো।

অনেক সময় তাঁর মতামত অনুযায়ী কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন—হিজাবের বিধান, বদরের বন্দিদের ব্যাপার ইত্যাদি।

উসমান (রাঃ)-এর লজ্জাশীলতা ও দানশীলতা

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা.) তাঁর অতুলনীয় লজ্জাশীলতা এবং অকাতর দানশীলতার জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। নবীজি (সা.) স্বয়ং তাঁর লজ্জাশীলতার প্রশংসা করেছেন এবং ফেরেশতারাও তাঁর হায়া বা লজ্জাকে শ্রদ্ধা করতেন। নিচে নির্ভরযোগ্য হাদিস ও রেফারেন্সসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। হজরত উসমান (রা.) এতটাই লাজুক ও লজ্জাশীল ছিলেন যে, স্বয়ং ফেরেশতারাও তাঁকে দেখে লজ্জা পেতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ গৃহে বিশ্রামরত ছিলেন এবং তাঁর উরু বা পায়ের নলা সামান্য উন্মুক্ত ছিল। এ সময় হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত উমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করলে নবীজি স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেন। কিন্তু যখন হজরত উসমান (রা.) অনুমতি চাইলেন, তখন নবীজি উঠে বসে নিজের কাপড় ঠিক করে নিলেন। পরবর্তীতে কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "আমি কি এমন এক ব্যক্তির সামনে লজ্জা করব না, যাকে দেখে ফেরেশতাগণও লজ্জাবোধ করেন?

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের মধ্যে তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ার্দ্র ব্যক্তি হলো আবু বকর, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলো ওমর এবং সবচেয়ে সত্যবাদী লজ্জাশীল হলো উসমান

তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিমদের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে উসমান (রাঃ) শত শত উট, ঘোড়া ও বিপুল সম্পদ দান করেন। তখন নবীজি ﷺ বলেন—

“আজকের পর উসমান যাই করুক, তা তাকে ক্ষতি করবে না।”

আলী (রাঃ)-এর সাহস ও ভালোবাসা

হযরত আলী (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি অসীম সাহস এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আলী ইবনে আবি তালিব ছোটবেলা থেকেই নবীজির ﷺ ঘরে বড় হন। তিনি ছিলেন সাহস, জ্ঞান ও আনুগত্যের প্রতীক।

হিজরতের রাতে নবীজিকে ﷺ হত্যা করার জন্য কাফিররা ঘর ঘিরে ফেললে আলী (রাঃ) নিজের জীবন বিপন্ন করে নবীজির ﷺ বিছানায় শুয়ে পড়েন।

মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি আদেশ ও উপদেশ হযরত আলী (রা.) নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এ ছিল নবীজির ﷺ প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার এক

অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি রাসুল (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে বিয়ে করেন এবং তাঁদের পবিত্র পারিবারিক জীবন ও ভালোবাসা মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুপ্রেরণা
খাইবার যুদ্ধে নবীজি ﷺ বলেন—
"আমি এমন একজনকে পতাকা দেব, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।" পরদিন সেই পতাকা আলী (রাঃ)-এর হাতে দেওয়া হয়।

দরিদ্র সাহাবিদের প্রতি আচরণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল দিক ছিল দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা। তিনি কখনো ধন-সম্পদকে মর্যাদার মানদণ্ড মনে করেননি; বরং তাকওয়া ও সৎকর্মকেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এজন্য দরিদ্র সাহাবিগণ তাঁর নিকট বিশেষ সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করেছিলেন।
ইসলামের আগে সমাজে ধনী-গরিবের বিশাল বিভেদ ছিল। কিন্তু নবীজি ﷺ সেই বৈষম্য ভেঙে দেন। বেলাল ইবনে রাবাহ- ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস। কিন্তু ইসলাম তাঁকে এমন মর্যাদা দেয় যে, তাঁর আযানের ধ্বনি মদিনার আকাশে প্রতিধ্বনিত হতো। একবার আবু যর (রাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে "কালো নারীর সন্তান" বলে সম্বোধন করলে নবীজি ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেনঃ
"তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের কিছু স্বভাব রয়েছে।"
এভাবে তিনি জাতিগত অহংকার নির্মূল করেছিলেন।

সাহাবিদের ভুলের প্রতি আচরণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও আদর্শ মানব। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কোনো ভুল বা ত্রুটি হলে তিনি কঠোরতা ও অপমানের পরিবর্তে দয়া, প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভুলকারীকে লাঞ্ছিত করা নয়; বরং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা
এ কারণে সাহাবিরা তাঁর কাছে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে সংকোচবোধ করতেন না। নবীজি ﷺ কঠোরতা দিয়ে নয়; বরং কোমলতা দিয়ে মানুষকে সংশোধন করতেন। এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিলে সাহাবিরা তাকে মারতে উদ্যত হন। কিন্তু নবীজি ﷺ তাঁদের থামিয়ে শান্তভাবে বোঝান।

তিনি জানতেন—মানুষকে অপমান করলে সে দূরে সরে যায়, কিন্তু ভালোবাসা দিলে তার হৃদয় বদলে যায়। সাহাবিদের ভালোবাসা নবীজির ﷺ প্রতি

সাহাবিগণ নবীজি ﷺ-কে নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

উহুদের যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের শরীর দিয়ে নবীজিকে ﷺ রক্ষা করেছিলেন। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ নিজের হাত দিয়ে তীর ঠেকাতে গিয়ে হাত অবশ করে ফেলেন।

আনাস ইবনে মালেক বলেনঃ

"আমি কাউকে কাউকে এত বেশি ভালোবাসতে দেখিনি, যতটা সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসতেন।" এক সাহাবিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—"তুমি কি চাও, তোমাকে ছেড়ে মুহাম্মাদ ﷺ তোমার জায়গায় থাকুক?"

মদিনায় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হিজরতের পর মুহাজির সাহাবিরা সবকিছু ছেড়ে মদিনায় আসেন। তখন নবীজি ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

আনসাররা নিজেদের ঘর, সম্পদ ও জমি মুহাজির ভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

যুদ্ধসমূহ ও শান্তিচুক্তি

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করা। মক্কা থেকে আগত মুহাজির সাহাবিগণ নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মদিনায় এসেছিলেন। অন্যদিকে মদিনার মুসলমানরা ছিলেন আনসার। রাসূল ﷺ ইসলামী সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (মুয়াখাত) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল মানব ইতিহাসের এক অনন্য সামাজিক বিপ্লব।

এই ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে একজন মুহাজিরকে একজন আনসারের ভাই হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আনসাররা নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও ব্যবসার অংশ পর্যন্ত মুহাজির ভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এর ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মাদ ﷺ -এর যুগ ছিল সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষের যুগ। মক্কার কাফিররা যখন ইসলামের দাওয়াতকে দমন করার জন্য নির্যাতন, অত্যাচার, বয়কট,

হত্যা ও যুদ্ধের পথ বেছে নেয়, তখন মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও দ্বীন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ইসলামের যুদ্ধগুলো কখনো ক্ষমতা, সম্পদ বা প্রতিশোধের জন্য ছিল না; বরং ছিল জুলুম প্রতিরোধ, ঈমান রক্ষা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। নবীজি ﷺ সর্বদা শান্তিকে প্রাধান্য দিতেন। যখনই শান্তিচুক্তির সুযোগ এসেছে, তিনি তা গ্রহণ করেছেন—even যদি বাহ্যিকভাবে তা মুসলমানদের জন্য কঠিন মনে হয়ে থাকে।

যুদ্ধের অনুমতি ও প্রেক্ষাপট

মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর মুসলমানরা নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তাঁদের মারধর করা হয়েছে, ঘরবাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু তখন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানরা একটি স্বাধীন সমাজ গঠন করলে কাফিররা বারবার আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা আত্মরক্ষার অনুমতি দেন।

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ও সা'দ ইবনে রাবি (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব। সা'দ (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক পর্যন্ত আবদুর রহমান (রা.)-কে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান (রা.) তা গ্রহণ না করে শুধু বাজারের পথ দেখিয়ে দিতে বলেছিলেন। এটি সাহাবিদের আত্মমর্যাদা ও পারস্পরিক ভালোবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাসূল ﷺ-এর এই পদক্ষেপের ফলে মদিনার সমাজে গোত্রীয় বিভেদ দূর হয়ে ঈমানভিত্তিক এক শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে ওঠে। আওস ও খাযরাজের দীর্ঘদিনের শত্রুতাও ইসলামের বন্ধনে মিলিত হয়

বদর যুদ্ধ

ইসলামের প্রথম মহান বিজয়- যুদ্ধের প্রেক্ষাপট- ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সশস্ত্র যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। ২ হিজরির ১৭ রমজান (৬২৪ সালের ১৩ মার্চ) মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সৌদি আরবের আল মদিনা প্রদেশের বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বড় যুদ্ধ। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের ধ্বংস করতে বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, আর কাফিরদের সংখ্যা প্রায় ১০০০জন

মুসলমানদের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্রও ছিল না। মাত্র দুটি ঘোড়া ও অল্প কিছু উট ছিল। কিন্তু তাঁদের অন্তরে ছিল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান।

বদরের যুদ্ধ কেবল সামরিক বিজয় ছিল না, এটি ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। পবিত্র কুরআনে একে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যের দিন বা 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে এই বিজয়ের মাধ্যমে মদিনায় নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত হয় এবং মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

নবীজির ﷺ দোয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও দোয়াকারী ব্যক্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এবং সাহাবিদেরও দোয়ার গুরুত্ব শিক্ষা দিতেন। সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-শান্তি—সব অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেন। তাঁর দোয়াগুলো শুধু মুখের শব্দ ছিল না; বরং ছিল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা, বিনয় ও আত্মসমর্পণের বাস্তব প্রকাশ।

দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন—

“দোয়াই ইবাদত।”

যুদ্ধের আগের রাতে নবীজি ﷺ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

উমার রাঃ বলেন—

“রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে হাত উঁচু করে এত বেশি দোয়া করছিলেন যে, তাঁর চাদর কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছিল।”

তিনি দোয়া করছিলেনঃ

“হে আল্লাহ! আজ যদি এই দল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।”

ফেরেশতাদের সাহায্য

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন। এই সাহায্য ছিল আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ এবং মুমিনদের জন্য সাহস ও আশার উৎস। বিশেষ করে বদর যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় ও শক্তিতে দুর্বল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেন। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, আর কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ জন। অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রীর দিক থেকেও মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্যের সুসংবাদ প্রদান করেন। এই সাহায্য শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিজরতের সময়, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মুহূর্তে এবং ইসলামের বিভিন্ন সংকটকালে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁর পথে অবিচল থাকে, আল্লাহ তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত উপায়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

ফেরেশতাদের সাহায্যের ঘটনাগুলো মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। তা হলো—বিজয় শুধু সংখ্যা, অস্ত্র বা বাহ্যিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না; বরং প্রকৃত বিজয় আসে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে। তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের ব্যাপারে আশাবাদী থাকা।

ধৈর্য ও আনুগত্যের পরীক্ষা

৩ হিজরিতে মক্কার কাফিররা বদরের প্রতিশোধ নিতে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০।

প্রথমদিকে মুসলমানরা বিজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। কিন্তু নবীজি ﷺ তীরন্দাজদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন—“কোনো অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না”—কিছু সাহাবি তা অমান্য করেন।

এর ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

নবীজির ﷺ আহত হওয়া

ইসলামের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার পথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ অসংখ্য কষ্ট, নির্যাতন ও আঘাত সহ্য করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উহুদ যুদ্ধে তাঁর আহত হওয়া।

৩ হিজরিতে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ সাহাবি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করলে যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এই সুযোগে কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত পাথরে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, নিচের চোয়ালের একটি দাঁত (রুবাইয়া) শহীদ হয়ে যায় এবং মাথার হেলমেটের লোহার দুটি কড়ি তাঁর গালে ঢুকে যায়। তাঁর মুখমণ্ডল

থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম গভীরভাবে ব্যথিত হন এবং তাঁকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তোলেন।

এই কঠিন মুহূর্তেও রাসূল ﷺ নিজের শত্রুদের জন্য বদদোয়া করেননি। বরং তিনি বলেন—

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না।"

এই ঘটনা তাঁর অসীম দয়া, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

উহুদের যুদ্ধে সাহাবিগণ নবীজিকে ﷺ রক্ষা করার জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগের নজির স্থাপন করেন। বিশেষ করে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উম্মে উমারাহ নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

উহুদের ঘটনা মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও মানবিক কষ্ট ও আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে প্রতিটি সংকট মোকাবিলা করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব)

৫ হিজরিতে আরবের বিভিন্ন গোত্র মিলে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করে। প্রায় ১০,০০০ সৈন্য মদিনা ঘেরাও করে।

সালমান ফার্সি - এর পরামর্শে মদিনার চারপাশে খন্দক খনন করা হয়—যা আরবদের কাছে নতুন কৌশল ছিল।

খন্দকের যুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে আহযাব ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনা। ৫ হিজরিতে সংঘটিত এই যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। কুরাইশ, গাতাফান এবং অন্যান্য মুশরিক গোত্রের প্রায় দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজারের মতো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও সংকটপূর্ণ।

শত্রুদের এই সম্মিলিত বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন সালমান আল-ফারিসি (রা.) পারস্যের যুদ্ধকৌশল অনুসারে মদিনার উন্মুক্ত দিকে একটি বিশাল পরিখা (খন্দক) খননের পরামর্শ দেন। রাসূল ﷺ এই মতামত গ্রহণ করেন এবং নিজেও সাহাবিদের সঙ্গে পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুধা, শীত ও ক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি সাহাবিদের উৎসাহ প্রদান করেন।

খন্দক খননের সময় একটি বিশাল পাথর ভাঙার ঘটনা ঘটে। সাহাবিরা তা ভাঙতে ব্যর্থ হলে রাসূল ﷺ নিজে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে একটি আলোর ঝলক দেখা যায় এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মুসলমানরা একদিন পারস্য, রোম ও ইয়েমেনের ভূখণ্ডে বিজয় লাভ করবে।

শত্রুবাহিনী মদিনার চারপাশে অবরোধ সৃষ্টি করে। প্রায় এক মাস ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে। মুসলমানরা চরম কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটায়। এই সময় মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পায় এবং মুমিনদের ঈমান আরও দৃঢ় হয়।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রবল ঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তীব্র বাতাসে শত্রুদের তাঁবু উপড়ে যায়, আগুন নিভে যায় এবং তাদের মধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের ঘটনা। এর পর থেকে কুরাইশরা আর কখনো মদিনার ওপর বড় ধরনের আক্রমণ চালানোর সাহস পায়নি। এই যুদ্ধ মুসলমানদের ধৈর্য, পরামর্শভিত্তিক নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

কঠিন পরিস্থিতি

খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা অত্যন্ত কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। চারদিক থেকে শত্রুবাহিনী মদিনাকে ঘিরে ফেলেছিল। কুরাইশ, গাতাফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের প্রায় দশ হাজার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজারের মতো। বাহ্যিকভাবে বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খাদ্যাভাব, প্রচণ্ড শীত, দীর্ঘ অবরোধ এবং অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ভয়।

পরিখা খননের সময় সাহাবিগণ এতটাই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে তাঁরা পেটে পাথর বেঁধে কাজ করতেন। রাসূল ﷺ নিজেও ক্ষুধার কারণে পেটে দুটি পাথর বেঁধেছিলেন। তবুও তিনি সাহাবিদের সাহস জুগিয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে মুসলমানদের মানসিক চাপও বৃদ্ধি পায়। শত্রুরা বাইরে থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আর মদিনার ভেতরে কিছু মুনাফিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল। এমনকি মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের

বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে মুসলমানরা একসঙ্গে বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের হুমকির সম্মুখীন হন।

আল্লাহ তাআলা সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে বলেন—

“যখন তারা তোমাদের ওপর ওপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে এসে পড়েছিল, যখন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা পোষণ করছিলে। সেখানে মুমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।”

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ঘটনা। ৬ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন। মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল কাবা শরীফ জিয়ারত ও উমরাহ আদায় করা, যুদ্ধ করা নয়। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। ফলে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

দীর্ঘ আলোচনার পর মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যা ইতিহাসে “হুদায়বিয়ার সন্ধি” নামে পরিচিত। চুক্তির কিছু শর্ত বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জন্য কঠিন মনে হয়েছিল। তাই অনেক সাহাবি প্রথমে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে এই চুক্তি গ্রহণ করেন।

চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, মুসলমানরা সে বছর উমরাহ না করেই মদিনায় ফিরে যাবে এবং পরবর্তী বছর এসে উমরাহ আদায় করবে। এছাড়া উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে আরব উপদ্বীপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। এই চুক্তির পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। যে সংখ্যক মানুষ হুদায়বিয়ার পূর্ববর্তী উনিশ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তার চেয়েও বেশি মানুষ হুদায়বিয়ার পরবর্তী দুই বছরে ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এই সন্ধিকে "সুস্পষ্ট বিজয়" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারণ

কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারণ ৮ হিজরিতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে তাওহীদের দাওয়াত, নির্যাতন,

হিজরত এবং বিভিন্ন সংগ্রামের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন। কিন্তু এই বিজয়ের মধ্যে প্রতিশোধ বা অহংকারের কোনো প্রকাশ ছিল না; বরং ছিল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, বিনয় এবং তাওহীদের প্রতিষ্ঠা।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম কাবাঘরের দিকে অগ্রসর হন। সে সময় কাবার ভেতরে ও চারপাশে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এসব মূর্তির পূজা করত এবং কাবাঘর, যা মূলত তাওহীদের কেন্দ্র ছিল, তা শিরক ও কুসংস্কারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

রাসূল ﷺ হাতে একটি লাঠি নিয়ে একে একে মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করতে থাকেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ ঘোষণা করেন—

"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সব দলকে পরাজিত করেছেন।"

এই ঘটনার মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার ভিত্তি চূড়ান্তভাবে ভেঙে যায় এবং তাওহীদের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।:

মক্কা বিজয়

ক্ষমা ও দয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ৮ হিজরিতে কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করলে নবীজি ﷺ ১০,০০০ সাহাবি নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন।

মক্কা প্রায় বিনা রক্তপাতে বিজিত হয়। যে শহরের মানুষ তাঁকে নির্যাতন করেছে, হত্যা করতে চেয়েছে এবং দেশছাড়া করেছে—সেই শহরে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেও তিনি প্রতিশোধ নেননি।

তিনি বলেনঃ

"আজ তোমাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।"

মক্কা প্রায় বিনা রক্তপাতে বিজিত হয়।

যে শহরের মানুষ তাঁকে নির্যাতন করেছে, হত্যা করতে চেয়েছে এবং দেশছাড়া করেছে—সেই শহরে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেও তিনি প্রতিশোধ নেননি।

কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারণ

মক্কা বিজয়ের (৮ হিজরি) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কাবাঘরকে শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে পবিত্র করা। ইসলামের আগমনের পূর্বে কুরাইশ ও আরবের বিভিন্ন গোত্র কাবার

ভেতরে ও চারপাশে অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করেছিল। ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী, কাবাঘরের ভেতরে ও বাইরে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মানুষ আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে আল্লাহর পরিবর্তে এসব মূর্তির উপাসনা করত, যা ছিল ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। তিনি একটি লাঠি বা ধনুকের আগা দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে করতে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

আরেক বর্ণনায় তিনি পড়েন—

সত্য এসেছে, আর মিথ্যা না পারে নতুন করে কিছু সৃষ্টি করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে! মূর্তিগুলো একে একে ভেঙে পড়তে থাকে। এরপর তিনি কাবাঘরের অভ্যন্তরে থাকা ছবি ও মূর্তির চিহ্নসমূহও অপসারণের নির্দেশ দেন। এভাবে বহু শতাব্দীর শিরক ও কুসংস্কারের অবসান ঘটে এবং কাবাঘর পুনরায় তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ঘটনা শুধু মূর্তি ভাঙার ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল মানুষের হৃদয় থেকে শিরক, কুসংস্কার ও মিথ্যা বিশ্বাস দূর করার এক মহান ঘোষণা। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণ করেছিলেন যে ইসলামের বিজয় প্রতিশোধের মাধ্যমে নয়, বরং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়

শিক্ষা

তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি; শিরকের কোনো স্থান নেই।

সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মিথ্যা নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মুসলিমদের জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কাবাঘর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য তাওহীদের প্রতীক ও কেন্দ্র।

বিদায় হজ

নবীজী ﷺ-এর জীবনের শেষ হজ ও উম্মাহর প্রতি শেষ মহা-নসীহত

১০ম হিজরি। ইসলাম তখন আরবের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘ ২৩ বছরের দাওয়াত, নির্যাতন, হিজরত, যুদ্ধ, ত্যাগ ও বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল সাঃ অনুভব করছিলেন—দুনিয়ার দায়িত্ব প্রায় শেষের পথে।

এই সময় তিনি ঘোষণা দিলেন যে তিনি হজ পালন করবেন। এ সংবাদ শুনে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক সাহাবী ছুটে আসেন মক্কার দিকে। কেউ উটের পিঠে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ দিনের পর দিন মরুভূমি অতিক্রম করে এসেছিলেন—শুধু একবার নবীজী ﷺ-এর সাথে হজ করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ পূর্ণাঙ্গ হজ।

বিদায় হজের পটভূমি

হিজরি দশম বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুভব করতে শুরু করেন যে তাঁর দুনিয়ার দায়িত্ব পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তাবুক অভিযানের পর ইসলামের শক্তি ও প্রভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এ সময় বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ কারণে নবম হিজরিকে "সানাতুল উফূদ" (প্রতিনিধি দলের বছর) বলা হয়।

১০ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন যে তিনি হজ পালন করবেন। এই সংবাদ দ্রুত সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। নবীজির ﷺ সঙ্গে হজ আদায়ের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য হাজার হাজার সাহাবি মদিনায় সমবেত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু হজ করা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে হজের বিধান সরাসরি শিক্ষা নেওয়া এবং তাঁর শেষ দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা।

এই হজ ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর আগে অধিকাংশ মুসলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এত বৃহৎ জনসমাবেশে একত্রিত অবস্থায় দেখেননি। তিনি এই হজের মাধ্যমে উম্মতের জন্য দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা, মানবাধিকার, নারীর

অধিকার, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, সুদ নিষিদ্ধকরণ, রক্তের পবিত্রতা এবং কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন—

"হয়তো এ বছরের পর আমি এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব না।" এই কথায় সাহাবিগণ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে এটি সম্ভবত তাঁর শেষ হজ। এজন্য ইতিহাসে এটি "হাজ্জাতুল বিদা" বা বিদায় হজ নামে পরিচিত হয়ে যায়।

বিদায় হজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হলো, এ সময় দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে। আরাফার ময়দানে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন—

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

এই আয়াত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিধানিক কাঠামো পূর্ণতা লাভ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের মিশন সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

বিদায় হজ ছিল শুধু একটি ইবাদত নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ মহা-সম্মেলন। এখানে তিনি এমন এক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার জন্য পথনির্দেশক হিসেবে থাকবে। তাই বিদায় হজের পটভূমি বুঝতে পারলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এটি ছিল নবুয়তের দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও দাওয়াতি জীবনের এক মহিমান্বিত সমাপনী অধ্যায়

মদিনা থেকে যাত্রা

২৫ জিলকদ ১০ হিজরিতে নবীজী ﷺ মাদিনা থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সাহাবী।

যাত্রার পূর্বে তিনি গোসল করেন, সুগন্ধি ব্যবহার করেন এবং ইহরাম পরিধান করেন। এরপর তিনি যুল-হুলাইফা (বর্তমান আবইয়ার আলী) মীকাতে পৌঁছে দুই রাকাআত সালাত আদায় করেন।

তারপর তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করেনঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থঃ

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।"

সাহাবীগণ চারদিক থেকে একসাথে তালবিয়া পড়ছিলেন। মরুভূমির আকাশ-বাতাস আল্লাহর তাওহীদের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

মক্কায় আগমন

নবীজী ﷺ ৪ জিলহজ্জ মক্কায় পৌঁছান। তিনি প্রথমে কাবাঘরে তাওয়াফ করেন। এরপর সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থঃ

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।”

সাফা পাহাড়ে উঠে নবীজী ﷺ কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া করেন। তারপর সাঈ সম্পন্ন করেন।

মিনায় অবস্থান

৮ জিলহজ্জ, যাকে “ইয়াওমুত তারওয়িয়া” বলা হয়, নবীজী ﷺ মিনায় যান। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেন।

মিনা ছিল যেন এক বিশাল ঈমানী প্রশিক্ষণশিবির। চারদিকে শুধু “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক” ধ্বনি।

আরাফার দিন বিদায় হজের মূল মুহূর্ত

৯ জিলহজ্জ। মানব ইতিহাসের এক মহান দিন। নবীজী ﷺ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হলেন।

তিনি “জাবালে রহমত”-এর নিকটে অবস্থান নিলেন এবং উম্মাহর উদ্দেশ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করলেন—যা “বিদায় হজের খুতবা” নামে পরিচিত।

তিনি বললেনঃ

“হে মানুষ! তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অপরের জন্য এ দিনের, এ মাসের ও এ শহরের ন্যায় পবিত্র।”

তিনি আরও বললেনঃ

“সাবধান! জাহিলিয়াতের সব সুদ রহিত করা হলো।”

নারীদের ব্যাপারে বললেনঃ

“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।”

মানবতার সমতা ঘোষণা করে বললেনঃ

"কোনো আরবের উপর অনারবের এবং কোনো অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাকওয়ায়।"

ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা

আরাফার ময়দানে এই মহান দিনের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দেন।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

এই আয়াত নাজিল হলে উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) কাঁদতে শুরু করেন।

কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—দ্বীন পূর্ণ হওয়ার অর্থ রাসূল ﷺ-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় নিকটে।

কুরবানী ও জামারাতে পাথর নিক্ষেপ

১০ জিলহজ্জ নবীজী ﷺ মিনায় ফিরে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। এরপর কুরবানী করেন। তিনি নিজ হাতে ৬৩টি উট জবাই করেন—যা তাঁর জীবনের বছরের সংখ্যার সমান ছিল।

তারপর মাথা মুন্ডন করেন। সাহাবীগণ তাঁর চুল সংগ্রহ করতে প্রতিযোগিতা করছিলেন বরকতের জন্য।

মানবতার সমতা

বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবতার ইতিহাসে এক অনন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা জাতি, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রগত অহংকারের সকল ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরব সমাজে বংশ-মর্যাদা, গোত্র, রঙ ও সম্পদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য করা হতো। শক্তিশালী গোত্র দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। বিদায় হজের ভাষণে নবী ﷺ এই অন্যায় ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন—

"হে মানুষ! তোমাদের রব একজন, তোমাদের পিতাও একজন। কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তবে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ব্যতীত।"

এই ঘোষণা ছিল মানবাধিকারের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘোষণা। এখানে বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা সামাজিক অবস্থানকে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। তাই জন্মগত কারণে কেউ সম্মানিত বা অপমানিত নয়; বরং আল্লাহর কাছে মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া ও সৎকর্ম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু কথার মাধ্যমে নয়, তাঁর বাস্তব জীবনেও এই শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। একসময়ের দাস বিলাল ইবন রাবাহ, পারস্যের সালমান আল-ফারসি এবং রোমান বংশোদ্ভূত সুহাইব আর-রূমী-কে তিনি সমাজে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে ইসলামে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় ঈমান, চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে; বংশ বা জাতির মাধ্যমে নয়।

বিদায় হজের এই শিক্ষা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীতে যখন বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, শ্রেণিবৈষম্য ও জাতীয়তাবাদের নামে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তখন বিদায় হজের এই বাণী মানবতার জন্য ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক চিরন্তন দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

অসুস্থতা, ওফাত ও ইন্তেকাল

নবীজী ﷺ-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের হৃদয়বিদারক অধ্যায়

১১ হিজরি। বিদায় হজের পর মুহাম্মাদ ﷺ মদিনায় ফিরে এলেন। বাহ্যিকভাবে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও সাহাবীগণ অনুভব করছিলেন—রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা, উপদেশ ও আচরণে বিদায়ের সুর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আরাফার ময়দানে রাসূল সাঃ বলেছিলেন—

“হয়তো এ বছরের পর আমি আর তোমাদের সাথে এ স্থানে মিলিত হতে পারবো না।”

সাহাবীদের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তখনও তারা কল্পনা করতে পারেননি—অতি শীঘ্রই মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন।

বিদায় হজের পর গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত

বিদায় হজের পর নবীজী ﷺ বিভিন্ন সময় এমন কিছু কথা বলছিলেন যা তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত বহন করছিল।

একদিন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ

একজন বান্দাকে আল্লাহ দুনিয়া ও তাঁর নিকট যা আছে—এ দুটির মধ্যে পছন্দের অধিকার দিয়েছেন। সে আল্লাহর নিকট যা আছে, তা-ই বেছে নিয়েছে।

এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—রাসূল ﷺ নিজেকেই ইঙ্গিত করছেন।

জান্নাতুল বাকি কবরস্থান সফর

এক রাতে নবীজী ﷺ জান্নাতল বাকির কবরস্থানে যান। সেখানে শায়িত মৃতদের জন্য দোয়া করেন।

তিনি বললেনঃ

“হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে গেছ যা পরবর্তীরা সম্মুখীন হবে।”

এ সফরও ছিল তাঁর বিদায়ের প্রস্তুতির অংশ

শেষ অসুস্থতার সূচনা

সফর মাসের শেষ দিকে নবীজী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীর এত উত্তপ্ত হয়ে যেত যে কাপড়ের উপর দিয়েও তাপ অনুভূত হতো।

আব্দুল ইবনে মাসুক (রা.) বলেনঃ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্পর্শ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো খুব বেশি জ্বর! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দু’জনের সমান জ্বর আমাকে দেওয়া হয়। এই অসুস্থতাও ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম।

স্ত্রীদের ঘরে অবস্থান ও আয়িশা (রা.)-এর কক্ষে আগমন

অসুস্থ অবস্থায়ও নবীজী ﷺ প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে পালাক্রমে যেতেন। কিন্তু অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি স্ত্রীদের অনুমতি চান যেন আয়শা (রা.)-এর কক্ষে অবস্থান করতে পারেন। সবাই অনুমতি দিলে তাঁকে দুই সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেষ দিনগুলোতে নামাজের গুরুত্ব

অসুস্থতার মধ্যেও নবীজী ﷺ বারবার সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করছিলেন। তিনি বলতেনঃ

“সালাত! সালাত! এবং তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।” তিনি নিজে দাঁড়াতে না পারলেও সাহাবীদের জামাআতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

আবু বকর (রা.)-কে ইমামতির নির্দেশ

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে নবীজী ﷺ বললেনঃ

“আবু বকরকে বলো, তিনি যেন মানুষদের সালাত পড়ান।”

এটি ছিল আবু বকরব(রা.)-এর মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

শেষ খুতবা ও উপদেশ

১০ হিজরির ৯ জিলহজ, আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজের খুতবা প্রদান করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ বৃহৎ জনসমাবেশে দেওয়া ভাষণ। এই খুতবায় তিনি মানবজাতির জন্য এমন কিছু মৌলিক নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের ওপর হারাম, যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহর পবিত্র।” এর মাধ্যমে তিনি অন্যায় হত্যা, সম্পদ আত্মসাৎ এবং মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।

তিনি জাহিলিয়াত যুগের সব ধরনের সুদ বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর সুদ বাতিল করা হলো। এর মাধ্যমে তিনি ন্যায়বিচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

নারীদের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, “নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।” তিনি স্বামীদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করার এবং পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই।” এভাবে তিনি গোত্র ও বংশের অহংকার দূর করে ঈমানভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেন।

মানবতার সমতা সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন, “কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের এবং কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া।”

সবশেষে তিনি উম্মতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন। তিনি বলেন, “আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব।” অন্য বর্ণনায় এসেছে, “আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।”

খুতবার শেষে তিনি সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করেন, “আমি কি আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?” সাহাবিগণ উত্তর দেন, “হ্যাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন।” তখন তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বলেন, “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।”

বিদায় হজের এই খুতবা ছিল নবী ﷺ-এর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের সারসংক্ষেপ এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন জীবনবিধান।

শেষ মুহূর্ত

বিদায় হজের কয়েক মাস পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি উম্মতের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তিত ছিলেন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বারবার সালাতের গুরুত্ব, মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে নসিহত করতে থাকেন।

অসুস্থতার এক পর্যায়ে তিনি আবু বকর (রা.)-কে মুসল্লিদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। এতে সাহাবিগণ বুঝতে পারেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়াবি জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবুও তাঁরা আশা করছিলেন যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দা সরিয়ে মসজিদে নববীতে সালাতে দাঁড়ানো সাহাবিদের দিকে তাকালেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থা দেখে তাঁর চেহারায় আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। সাহাবিগণ ভেবেছিলেন, হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু সেটিই ছিল তাঁদের জন্য নবীজির ﷺ শেষ দর্শন।

এরপর তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর কক্ষে ফিরে আসেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি বারবার বলছিলেন:

"আস-সালাহ, আস-সালাহ; ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম।"

অর্থাৎ, "সালাতের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, সালাতের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। শেষ সময়ে তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলেন:"আল্লাহুম্মা ফির-রাফীকিল আ'লা।"
অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! সর্বোচ্চ সঙ্গী (জান্নাতে আপনার নৈকট্য) চাই।"
এরপর তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দেন। তাঁর বয়স তখন ছিল ৬৩ বছর। তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মদিনা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সাহাবিগণ এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে অনেকেই প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেননি। উমর (রা.) আবেগে বলছিলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি। তখন আবু বকর (রা.) এসে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন—
"যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।"
এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:
"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাতে ফিরে যাবে?"
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ মুহূর্ত ছিল তাওহীদ, সালাত এবং উম্মতের কল্যাণের চিন্তায় পরিপূর্ণ। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর উম্মতের হিদায়াত ও সফলতার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। এটাই ছিল একজন নবীর উম্মতের প্রতি সীমাহীন আয়শা (রা.) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে পানির পাত্র ছিল। তিনি হাত পানিতে প্রবেশ করিয়ে মুখমণ্ডল মুছছিলেন এবং বলছিলেন—
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয় মৃত্যুর অনেক কষ্ট রয়েছে।'"
এবং এভাবেই মানবতার শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

সাহাবীদের অবস্থা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সংবাদ সাহাবিদের ওপর এমন এক শোকের পাহাড় নিয়ে এসেছিল, যা তাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর একটি। তারা শুধু একজন নেতা, শাসক বা শিক্ষককে হারাননি; বরং হারিয়েছিলেন সেই মহান ব্যক্তিত্বকে,

যিনি তাদের ঈমানের আলো দেখিয়েছিলেন, জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মদিনার পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। সাহাবিগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। অনেকেই এই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাদের কাছে মনে হচ্ছিল, যেন পৃথিবীর সব আলো এক মুহূর্তে নিভে গেছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শোকে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি বলছিলেন, “আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেননি। তিনি তাঁর রবের কাছে গিয়েছেন, যেমন মূসা (আ.) গিয়েছিলেন। তিনি আবার ফিরে আসবেন।” এমনকি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর কথা বললে তিনি তাকে শাস্তি দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছিলেন। এটি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শোকের বহিঃপ্রকাশ।

এদিকে আবু বকর (রা.) সংবাদ পেয়ে দ্রুত এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক দেখে তাঁকে চুম্বন করেন এবং বলেন, “আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুটি মৃত্যু একত্র করবেন না। আপনি সেই মৃত্যুই বরণ করেছেন, যা আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল।”

এরপর তিনি মসজিদে গিয়ে সাহাবিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।”

এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন:

“মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাতে ফিরে যাবে?”

এই আয়াত শুনে সাহাবিগণ যেন বাস্তবতায় ফিরে আসেন। উমর (রা.) পরে বলেন, “আবু বকর (রা.)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে আমার পা দুর্বল হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন।”

সাহাবিদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, “যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করেছিলেন, সেদিনের চেয়ে উজ্জ্বল দিন আমরা আর দেখিনি। আর যেদিন তিনি ইন্তিকাল করলেন, সেদিনের চেয়ে অন্ধকার দিনও আমরা আর দেখিনি।”

তবুও সাহাবিগণ শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। তারা বুঝতে পারেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন শেষ হয়নি; বরং এখন তাদের ওপর দায়িত্ব এসেছে তাঁর দাওয়াত, শিক্ষা ও আদর্শকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার। তাই গভীর শোকের মধ্যেও তারা ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সাহাবিদের এই ধৈর্য, ঈমান এবং আত্মত্যাগ মানব ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাঁদের ভালোবাসা ছিল আবেগপূর্ণ, কিন্তু তাঁদের আনুগত্য ছিল আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি অটুট।

দাফন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সাহাবিগণ গভীর শোক ও বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তবে শোকের মধ্যেও তাঁদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোথায় দাফন করা হবে? কেউ কেউ প্রস্তাব করেন তাঁকে মক্কায় দাফন করা হোক, কেউ বলেন বায়তুল মুকাদ্দাসে, আবার কেউ কেউ মদিনার কবরস্থানে দাফনের কথা বলেন।
এ সময় আবু বকর (রা.) একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:
"আল্লাহ কোনো নবীর রূহ কবজ করেন না, তবে সেই স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়, যেখানে তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে।"
এই হাদিস শোনার পর সাহাবিগণ একমত হন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই কক্ষেই দাফন করা হবে, যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেছেন; অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর ঘরে।
মঙ্গলবার পুরো দিন এবং রাতের একটি অংশ সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল, কাফন ও দাফনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর গোসলের দায়িত্ব পালন করেন আলী ইবন আবি তালিব (রা.), আব্বাস (রা.), ফাদল ইবন আব্বাস (রা.), কুসাম ইবন আব্বাস (রা.) এবং উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.) প্রমুখ। তাঁকে তিনটি সাদা সুতির কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।
এরপর মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাজার সালাত আদায় করেন। তাঁর মর্যাদার কারণে কোনো একজনকে ইমাম করা হয়নি; বরং মানুষ দলবদ্ধভাবে প্রবেশ

করে পৃথকভাবে জানাজার সালাত আদায় করেন। প্রথমে পুরুষরা, এরপর নারীরা এবং পরে শিশুরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

বুধবার রাতের দিকে তাঁর কবর খনন করা হয়। আবু তালহা আল-আনসারী (রা.) লাহদ পদ্ধতিতে কবর প্রস্তুত করেন। এরপর সাহাবিগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কবর মুবারকে শায়িত করেন।

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, “যেদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করলাম, সেদিন আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল এবং আমাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইন্তিকালের স্থানে দাফন করার মধ্য দিয়ে নবুয়তের যুগের সমাপ্তি ঘটে। তবে তাঁর শিক্ষা, সুন্নাহ এবং আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য হিদায়াতের আলো হয়ে থাকবে।

আল্লাহ বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থঃ

“প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”

ওফাত-পরবর্তী প্রভাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত শুধু মদিনা বা আরবের জন্য নয়, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ছিল এক মহাবিপর্যয়। সাহাবিগণ এমন এক শোকের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যার তুলনা তাঁদের জীবনে আর কখনো আসেনি। ওহির ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, নবুয়তের যুগের সমাপ্তি ঘটল এবং মুসলিম সমাজকে প্রথমবারের মতো নবী ﷺ-কে ছাড়া পথ চলার বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হলো।

তবে আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী এই কঠিন পরীক্ষাই মুসলিম উম্মাহর পরিপক্কতা ও দৃঢ়তার সূচনা করে। সাহাবিগণ দ্রুত উপলব্ধি করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হলেও তাঁর আনা দ্বীন চিরঞ্জীব। তাই তাঁরা শোকের মধ্যেও দ্বীনের দায়িত্ব পালনে অটল থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে আসে, তা হলো মুসলিম নেতৃত্বের প্রশ্ন। সাহাবিগণ পরামর্শের মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে

খলিফা নির্বাচিত করেন। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সুসংগঠিত হয় এবং মুসলিম সমাজ বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

অন্যদিকে আরবের কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করতে শুরু করে। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা.) দৃঢ়তার সঙ্গে রিদ্দাহ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র পুনরায় স্থিতিশীল হয় এবং বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল কুরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজ শহীদ হওয়ার পর আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে কুরআন একত্রে সংকলনের কাজ শুরু হয়। এর ফলে আল্লাহর কিতাব সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নির্ভুলভাবে পৌঁছে যায়।

সাহাবিগণ তাঁদের প্রিয় নবী ﷺ-এর শিক্ষা ও আদর্শকে শুধু সংরক্ষণই করেননি; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় অল্প কয়েক দশকের মধ্যেই ইসলাম আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে শাম, ইরাক, মিসর, পারস্য এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত মুসলিমদের শিখিয়েছে যে ব্যক্তি নয়, আদর্শই স্থায়ী। নবী ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ, তাঁর শিক্ষা, তাঁর চরিত্র এবং তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন আজও কোটি কোটি মানুষের জীবন পরিচালনা করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাতে ফিরে যাবে?"

এই আয়াত সাহাবিদের যেমন দৃঢ়তা দিয়েছিল, তেমনি আজও মুসলিমদের শিক্ষা দেয় যে দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক কোনো ব্যক্তির জীবনের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা আল্লাহর চিরন্তন হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহ নতুন এক যুগে প্রবেশ করে। এটি ছিল পরীক্ষা, ত্যাগ, সংগ্রাম ও দায়িত্বের যুগ। আর সাহাবিগণ সেই পরীক্ষায় সফল হয়ে মানব ইতিহাসে ঈমান, ধৈর্য ও আনুগত্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

জীবন থেকে শিক্ষা ও উপসংহার

মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্ম মানব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তাঁর আগমনের মাধ্যমে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আলোর সূচনা হয়। তিনি মানবতাকে শিরক, অন্যায় ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর শৈশব ও কৈশোরকাল মানবজাতির জন্য এক অনন্য আদর্শ। তাঁর জীবন থেকে আমরা ধৈর্য, সততা, দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা লাভ করি। এতিম ও কষ্টময় জীবন পার করেও তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। বরং শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। মহান আল্লাহ তাঁকে ধীরে ধীরে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যাতে তিনি পরবর্তীতে বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও সর্বশেষ নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর নির্যাতন ও ত্যাগের ঘটনাগুলো কেবল ইতিহাসের কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতি নয়; বরং এগুলো ঈমানের জীবন্ত উদাহরণ, যা প্রতিটি যুগের মুসলিমের অন্তরকে নাড়া দেয়। তাদের জীবন আমাদের শেখায়— আল্লাহর পথে চলতে গেলে কষ্ট আসবেই, কিন্তু সেই কষ্টই একজন মুমিনকে আল্লাহর নিকট আরও প্রিয় করে তোলে।

মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে যখন তাদের শরীর পুড়ছিল, ক্ষুধায় যখন শিশুদের কান্না আকাশ ভারী করছিল, তখনও তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত ছিল। তারা জানতেন, দুনিয়ার এই সাময়িক কষ্টের বিনিময়ে আখিরাতে রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ও জান্নাতের সুখ। তাই শত নির্যাতনের মাঝেও তারা ঈমান থেকে পিছপা হননি।

সাহাবিদের জীবন আমাদের সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা দেয়, তা হলো— সত্যিকার ঈমান মানুষের অন্তরকে অটল করে দেয়। দুনিয়ার ভয়, মানুষের হুমকি কিংবা কষ্ট তখন তাকে দুর্বল করতে পারে না। কারণ সে বুঝে যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টিই জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।

তাদের জীবনে আমরা ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তারা কখনো আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হননি। বরং প্রতিটি কষ্টের মাঝেও আল্লাহর সাহায্যের আশায় ছিলেন। আজ আমরা সামান্য বিপদেই হতাশ হয়ে পড়ি, অথচ সাহাবিরা বছরের পর বছর নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহর উপর ভরসা হারাননি।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ত্যাগ আমাদের আরও শেখায়— দ্বীনের জন্য কুরবানি ছাড়া সম্মান আসে না। কেউ নিজের সম্পদ উৎসর্গ করেছেন, কেউ জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করেছেন, কেউ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, আবার কেউ নিজের জীবন পর্যন্ত আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের কাছে দুনিয়ার আরাম অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা ছিল অনেক বড়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

“মানুষ কি মনে করে যে, তারা বলবে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?”

এই আয়াত সাহাবিদের জীবনে বাস্তব রূপ পেয়েছিল। তারা পরীক্ষার আগুনে পুড়ে আরও খাঁটি ঈমানদার হয়ে উঠেছিলেন।

তাদের জীবন আমাদেরকে এই কথাও শেখায়— ইসলাম কেবল মুখে উচ্চারণ করার নাম নয়; বরং তা ত্যাগ, ধৈর্য, ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণের নাম। ইসলামের যে আলো আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছে, তার পেছনে রয়েছে সাহাবিদের অশ্রু, রক্ত, ক্ষুধা, নির্ঘুম রাত এবং সীমাহীন কুরবানি।

বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর জীবন এক উজ্জ্বল আদর্শ। যখন আমরা দ্বীনের পথে সামান্য বাধা পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন সাহাবিদের জীবনের দিকে তাকালে নতুন করে সাহস ফিরে পাই। তাদের জীবন আমাদের শেখায়— আল্লাহর পথে কষ্ট কখনো বৃথা যায় না।

শেষ পর্যন্ত সাহাবিদের জীবন আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে—

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা চিরস্থায়ী। তাই একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা হলো, সব পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর অটল থাকা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানানো।

তথ্যসূত্র:

১.আব্দুল মুত্তালিব- এর জীবনী

ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী /ইবনে ইসহাক/সীরাতু

রাসূলুল্লাহ/সফিউর রহমান মুবারকপুরী/আর-রাহীকুল মাখতুম

ইবনে কাসীর/সূরা আল-ফীল, আয়াত ১

২. রাসূল সাঃ এর জন্ম সাল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আর রাহিকুল মাখতুম/ইবনে হিসাম/আল বিদায়া আন নিহায়া/তারিক আল তাবারি/সীরাতে রাসুলুল্লাহ সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭ /সহি মুসলিম/সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২২৬২/ সীরাতে ইবনে হিশাম,১-১৮০–১৮৫/ আর রাহীকুল মাখতূম,৬০–৬৩ /সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২২৬২/আর রাহীকুল মাখতূম,৫৩–৫৫ /সীরাতে ইবনে হিশাম, ১-১৬৮/১৭০আর-রাহীকুল মাখতূম,৫৬(সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ৬/

৩. পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান

সহিহ বুখারি, হাদিস নং:৫৩০৪

৪. হযরত খাদিজা (রা.) জীবন ও ভূমিকা

সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩/ মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৪৮৬৪/সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩৮১৮/ সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩৮২০/ সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৩৮১৫/

সূরা আন-নূর, আয়াত : ২৬

৫.যৌবনকাল ও ব্যবসায়ী জীবন

আল-কলম৪/সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২২৬২/সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ১২০৯/সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০২/সূরা আল-মুতাফফিফীন,: ১-৩/মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৬৫৫/সহিহ মুসলিম/

নবুয়তের পূর্ববর্তী জীবন

সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১১/আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭২-৭৪।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬/আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৫-৭৬।

আশ-শিফা, কাজী ইয়াদ, ১ম খণ্ড/সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৩/আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৮-৮০।

সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৭/সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৩/সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৬০/আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৮০-৮৫/সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭-২৪২।

৬.প্রথম ওহি ও নবুয়ত প্রাপ্তি

আল-আলাক : ১/আল আলাক-১–৫/সূরা আল-মুদ্দাসসির : ১–২/আলে ইমরান : ১৬৪/সূরা ইখলাস : ১/ সহীহ বুখারী/সহীহ মুসলিম:২৬৩১/ সুনানে ইবনে মাজাহ-২২৪/ফিকহুস সীরাহ/

৭.মক্কী জীবন ও দাওয়াত

সূরা ইবরাহীম : ১/সূরা আল-আলাক : ১/সহীহ বুখারী, হাদিস ৩/সহীহ বুখারী, হাদিস : ৪৯৫৩/সহীহ বুখারী, হাদিস ৩৬১২/

৮.হযরত খাদিজা (রা.) জীবন ও ভূমিকা

মুহাম্মাদ - ৭

৯.মক্কী জীবন ও দাওয়াত

জামে তিরমিযী, হাদিস : ৩৭৩৫/সহীহ বুখারী, ৩২৩১/ সহীহ বুখারী, হাদিস : ৩৪৯/ সহীহ বুখারী, ১/

সহীহ মুসলিম, ১৯০৭/মুবারকপুরী, ২০১৫, পৃ. ৯৫,/ইবনে সাদ, ১৯৯০, খণ্ড ১, /পৃ.২২৬/আল-বলাযুরী, ১৯৯৬, খণ্ড ১, পৃ. ১১৫

১০.নির্যাতন ও সাহাবিদের ত্যাগ

সহীহ আল-বুখারী/ইবনে হিশাম/ আর-রাহীকুল মাখতূম/

মুসনাদ আহমদ/তাফসীরে ইবনে কাসীর/ইবনে হিশাম/ সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৩৬১২/আর-রাহীকুল মাখতূম/

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/ইবনে হিশাম/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া /ইমাম ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০ [২.২.১]ইবনে হিশাম/আর-রাহীকুল মাখতূম/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/সহীহ বুখারী, হাদিস : ১সহীহ মুসলিমহাদিস : ১৯০৭/মুবারকপুরী, ২০১৫, পৃ. ৯৫,/

ইবনে সাদ, ১৯৯০, খণ্ড ১, পৃ. ২২৬/আল-বলাযুরী, ১৯৯৬, খণ্ড ১, পৃ. ১১৫

১১.হিজরত

সূরা আত-তাওবা, ৯:২০/সহীহ বুখারী/সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০/সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৯০৭ ও ৩৯১১/

১২.মদিনায় ইসলামী সমাজ গঠন

আর-রাহীকুল মাখতূম/আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯০৬/আর-রাহীকুল মাখতূম/আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ/

সহীহ বুখারী, হাদীস ৪২৮/ সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭সহীহ বুখারী/হাদীস ৩৭৮১/আর-রাহীকুল মাখতূম/ সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭/সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০২/সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৮৯৫/

১৩.মদিনায় ইসলামী সমাজ গঠন

ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ১/৪৯৪-৪৯৭/ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/২১৩/সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৮৩৪/ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, The First Written Constitution in the World, পৃ. ২৩-২৮;ইবন হিশাম, ১/৫০১-৫০৩/(সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৫/ তাফসীর ইবন কাসীর/

আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮১/সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৩/ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৯৫২;

ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/২৯০/সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮০৩/আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৩১-৩৪৫।

১৪.পারিবারিক জীবন (স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ)

সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৪১৬/মুসনাদ আহমাদ/ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ১/২০৩-২০৫ / আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৭৮-৮০/ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৬৪৭/ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫৪২/সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৭৮/— সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৫৬৭/সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮১৮/মুসনাদে আহমাদ/সহীহ বুখারী/সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৭১৪/সহীহ বুখারী/সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩/

১৫.সাহাবিদের সাথে সম্পর্ক

সহীহ বুখারীর খণ্ড ১, হাদিস ১৫/সহীহ বুখারী ও মুসলিম/সহিহ বুখারি: ৩৬৬২/ সহিহ বুখারি: ৩৬৫৬/ সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০/জামে তিরমিযী/সহিহ মুসলিম ৬১০১/

সুনান আত-তিরমিজি ৩৭৯০/মিশকাতুল মাসাবিহ/জামে তিরমিযী/ সহীহ বুখারী/ ইবনে হিশাম/সিরাতে ইবনে হিশাম'/ইবন হিশাম/আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৪১৫-৪১৭/তাফসীর ইবন কাসীর/সহীহ বুখারী/

সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ২২০, ৬১২৫/সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫/ইমাম নববী/শরহ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯০-১৯২/ সফিউর রহমান মুবারকপুরী/ আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ.৫৬৮-৫৭০/ইবন হিশাম/ আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ১৫০-১৫৪।

ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৩, পৃ. ২২৬-২২৮/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২০৭-২১০/— (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৬৩) সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮১,/শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, খণ্ড ২, পৃ. ১০৮-১১২/সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৬৩/ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৩-২৬৮।

ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৯-২৯৪/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৫৫-২৬০/তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আল-আনফাল, ৮:৯; সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৩/ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৭-৭৪/ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৫-৪২/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৩৬-৩৪২/সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৪০৭৫, ৪০৭৬/সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯০/তাফসীর ইবন কাসীর/ ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ২২১-২৩৫/ইবন কাসীর/, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৯৩-১০৮/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৮৪-৩৯৭/শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, খণ্ড ২, পৃ. ২৭০-২৮০।

তাফসীর ইবন কাসীর, সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৪১০১/সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১০-১১/ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ২২৬-২৩২।

ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৯৮-১০৪/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৮৮-৩৯৪/তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ১০-২২/সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৪১০০/সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮০৩/ ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৩০৮-৩২২/ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৯-১৮১/সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৪৭-৪৬১।

শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮৭-৩৯৮/সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ২৭৩১/তাফসীর ইবন কাসীর, সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৮, ৪২৮৭/২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮১।

৩. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৮-৫২/৪. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৯৮-৩০৩।

৫. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫৩৭-৫৪১।

৬. তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১।

সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫/সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১/সূরা সাবা, ৩৪:৪৯/সহীহ আল-বুখারী/সহীহ মুসলিম/আর-রাহীকুল মাখতূম/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/তাফসীর ইবন

১৬.বিদায় হজ

সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮/সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩/

সহীহ মুসলিম/সহীহ আল-বুখারী/আর-রাহীকুল মাখতূম/যাদুল মাআদ/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/তাফসীর ইবন

/সহীহ বুখারী, হাদিস: ১৫৪৯/আল-বাকারা, ২:১৫৮/সহীহ বুখারী, হাদিস: ১৭৩৯/সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮

/মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ২৩৪৮৯/মায়িদাহ, ৫:৩/সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৫/সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৩০৫/মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ২৩৪৮৯/

১৭.অসুস্থতা, ওফাত ও ইন্তেকাল

সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮/সহীহ বুখারী, হাদিস ৩৬৫৪/সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৯৭৪/সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫৬৪৮/সহীহ বুখারী, হাদিস: ১৯৮/সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫১৫৬/সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬৮৭/রেফারেন্স:

সহীহ মুসলিম, হাদিস ১২১৮/সহীহ আল-বুখারী/কিতাবুল হজ্জ/মুসনাদ আহমাদ/আর-রাহীকুল মাখতূম/যাদুল মাআদ/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া/(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪/

সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৪৪৪৯, ৪৪৫৪, ৪৪৫৫।

সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৪৪৪/আর-রাহীকুল মাখতূম।

যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়্যিম/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসীর/শামায়িলে তিরমিযী/সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ১২৪১, ৩৬৬৭, ৪৪৫২, ৪৪৫৪/

সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৩৮২/আশ-শামায়িল আত-তিরমিযী/আর-রাহীকুল মাখতূম/আল-বিদায়া ওয়ান/নিহায়া, ইবন কাসীর/সীরাতে ইবন হিশাম/ সহীহ ইবন মাজাহ, হাদিস ১৬২৮/জামি' আত-তিরমিযী, হাদিস ১০১৮/মুসনাদ আহমাদ, হাদিস ৬/সীরাতে ইবন হিশাম, ৪র্থ খণ্ড/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসীর, ৫ম খণ্ড/আর-রাহীকুল মাখতূম, শেষ অধ্যায়/যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়্যিম

১৮.ওফাত-পরবর্তী প্রভাব

সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৪৪৫৪, ৪৪৫৫/সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৩৮২/সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪/তারীখ আত-তাবারী/আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসীর। আর-রাহীকুল মাখতূম/যাদুল মাআদ/সীরাতে ইবন হিশাম/— সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২